ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

চতুর্থ বর্ষ ● সংখ্যা : ১১
জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২০

অসহায় মানুষের মধ্যে দ্বীনি দাওয়াতের কৌশল

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে শ্রমজীবী মানুষ

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও ইসলামে নারীর অধিকার

আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

চতুর্থ বর্ষ ● সংখ্যা ১১
জুলাই-সেপ্টেম্বর- ২০২০

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর-২০২০

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

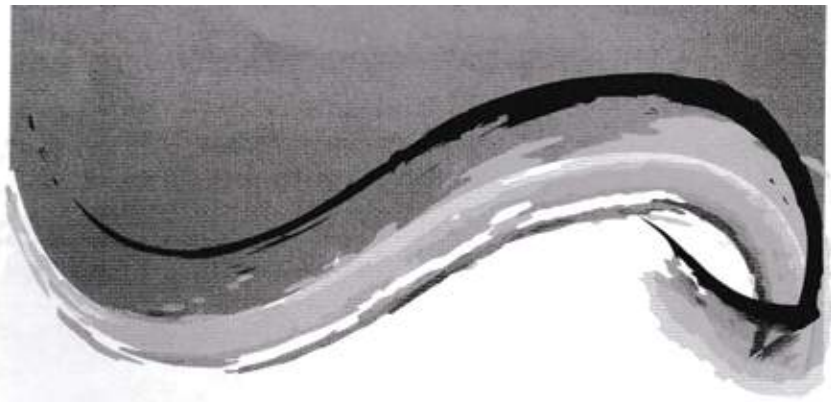

সূচিপত্র

অসহায় মানুষের মধ্যে দ্বীনি দাওয়াতের কৌশল অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৩
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে শ্রমজীবী মানুষ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	৬
আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম	১১
আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা আতিকুর রহমান	১৫
আই.কিউ, প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি	১৭
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও ইসলামে নারীর অধিকার ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক	২২
রিকশা চালকদের আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে করনীয় ড. আজগর ইবনে হযরত আলী	২৭
কৃষিতে ইসলামের অবদান কৃষিবিদ মুহাম্মদ রাকিব হাসান	২৯
শ্রমিক কল্যাণ ও আমাদের জীবন টি এইচ সরকার	৩৪
কিশোর গ্যাং সমাজে নতুন সংকটের নাম সামছুদ্দোহা শাকিল	৩৬
মাতৃভক্তি	৩৮
যে সকল পানীয় শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়	৪০
ফেডারেশন সংবাদ	৪১

সম্পাদকীয়

"নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাড়ছে
জালিমের কালো থাবা বিষাক্ত লোলুপতা
স্বাধীনতা স্বাধীকার কাড়ছে"

আজকের আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হলো শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের নিরলস পরিশ্রম। হাজার হাজার বছর ধরে যে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-ঘামে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা থেকে সেই শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীই থেকেছে উপেক্ষিত। আজকের আধুনিক উন্নত-সমৃদ্ধ পৃথিবীর কারিগর এসব অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে অব্যাহত রয়েছে নিরন্তর সংগ্রাম। স্বাধীকার ও অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে নানা অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের সব খবর না আসে মিডিয়ায়, না আসে পত্রিকায়। এই শোষণ ও বঞ্চিত মানুষগুলি আত্ম চিৎকার করে বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও" (সূরা আন-নিসা-৭৫) তাদের চিৎকার হয়তো দৃশ্যমান নয় বা আকাশে বাতাসে প্রকম্পন ছড়ায়না অথবা পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করেনা। কিন্তু তাদের চিৎকার ঠিকই আরশের মালিকের নিকট পৌছায়। মহান রব! হয়তো বা কারো মাধ্যমে মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করে থাকেন। কোন সমস্যা বা দুর্ঘটনা ঘোষণা দিয়ে আসে না। সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস বা কোভিট-১৯ একটি বড় ধরণের সমস্যা।

করোনা পরিস্থিতিতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শ্রমজীবি মানুষ। সরকারের দায়িত্ব ছিল এই অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু সরকার নামমাত্র সহযোগীতা করেছে বা প্রকৃত শ্রমিকরা সেই সহায়তা পায়নি। সব জায়গায় দূর্নীতি ও লুটপাট চলছে। সবার মনোযোগ কিভাবে টাকার মালিক হওয়া যায়, এই অসম প্রতিযোগীতা সর্বত্র চলছে। এইসব প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দুর্নীতি, লুটপাট, অনিয়ম আর দায়িত্ব অবহেলার ছড়াছড়ি।

তিতাসের দায়িত্ব অবহেলায় নারায়ণগঞ্জের তল্লা মসজিদের দুর্ঘটনা এর সাম্প্রতিক বড় উদাহরণ। আমরা কোন দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে চাইনা। যদি রানাপ্লাজা, তাজরীন ফ্যাশন সহ যত দুর্ঘটনা ঘটেছে তা থেকে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা নিতেন তা হলে তল্লা মসজিদের ঘটনা পূনঃবৃত্তি হতোনা।

সমাজে অনেক সমস্যার মধ্যে নতুন সমস্যা কিশোর গ্যাং। আমাদের কচি কাচা কিশোররা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কৌশলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বিপদের দিকে। আজকাল কিছু সিনেমা কিশোরদের উস্কে দিচ্ছে। তাদের টিম গঠন, বিভিন্ন মিশনের কার্যকলাপ দেখে কিশোররা নিজেদের জীবনকে ঠিক সেভাবে সাজাতে চায়। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না। শহরের অলি গলি থেকে শুরু করে উপশহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র কিশোরদের অর্থের মোহ ও রঙ্গিন দুনিয়ার স্বপ্ন দিয়ে তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে। এখনই সময় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার।

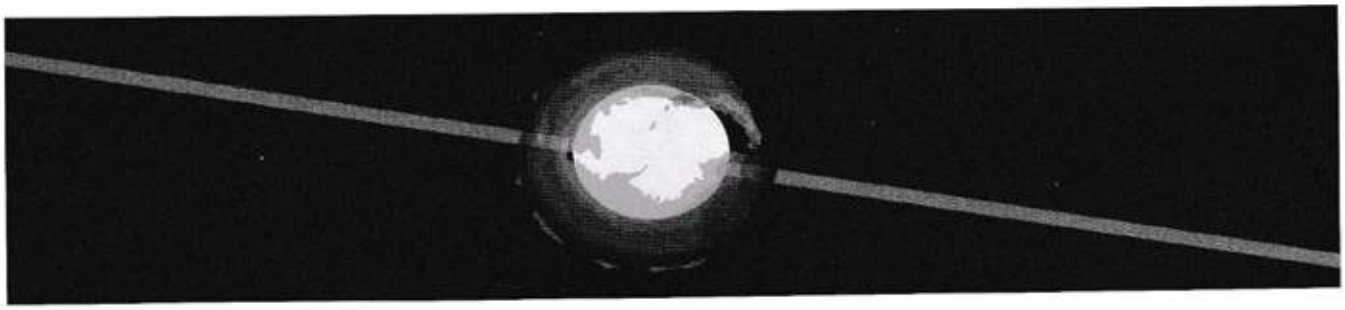

অসহায় মানুষের মধ্যে দ্বীনি দাওয়াতের কৌশল

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ - أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ - يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا - أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ
أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ - وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ - فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ
أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ - أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ - عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

সরল অর্থ:

৪. বস্তুত আমি মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী করে সৃষ্টি করেছি ৫. সে কি ধারনা করে নিয়েছে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবেনা ৬. গল্প করে বলে আমি প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি ৭. সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি? ৮-৯. আমি কি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহবা এবং দুটো ঠোঁট দেইনি? ১০. আর (ভাল-মন্দ) উভয় সম্পর্কে পথ কি তাকে দেখাইনি? ১১. কিন্তু সে দুর্গম পথটি অতিক্রম করার সাহস করেনি ১২. তুমি কি জান সে দুর্গম কঠিন পথ কি? ১৩. মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা ১৪. কিংবা অভুক্ত মানুষকে খাবার প্রদান ১৫. নিকটবর্তী ইয়াতিমকে খাবার প্রদান ১৬. অথবা ধুলামলিন মিসকিনকে খাওয়ানো ১৭. আর সেই সঙ্গে শামিল হওয়া লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারনের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় ১৮-১৯. এ লোকেরাই ডান পন্থী (জান্নাতী) যারা আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করে তারা বামপন্থী ২০. তাদের উপর আগুন বেষ্টনকারী হয়ে থাকবে।

নামকরণ: প্রথম আয়াতে 'বালাদ' (بَلَد) কথাটি আছে সে শব্দ অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল: নবী করিম (সা:)- এর উপর মক্কায় চরম অত্যাচারের সময় এ সূরা নাজিল হয়, যখন রাসূলের উপর অমানবিক অত্যাচার, নিপিড়নকে মক্কার কাফির মুশরিকেরা বৈধ মনে করতো।

ব্যাখ্যা:

৪নং আয়াত: মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে যে, এ দুনিয়া আনন্দ উল্লাস করা ও আরাম আয়েশের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি বরং কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট করার জায়গা। সমস্ত নবীগণ কঠোর পরিশ্রম করেই জীবন যাপন করেছেন। নবী করিম (সা:) বলেছেন- "পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেনি যারা ছাগল চড়াননি।" মরুভূমিতে ছাগল চড়ানো কঠিন কাজ আর সকল নবী সে কাজটি করেই বড় হয়েছেন। সকল নবীকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহুমুখী বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। একজন মানব শিশু থেকে বড় হতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। একজন বাদশা তার শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। তাকে যুদ্ধ করতে হয় বা আন্দোলন করতে হয়। তারপর যুদ্ধে বিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে সে জন্য সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়। মোট কথা, ছোট হোক আর বড় হোক, ধনী হোকে আর গরীব হোক, রাজা হোক আর প্রজা হোক, মালিক হোক আর শ্রমিক হোক কোন ব্যক্তিই নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততায় জীবনযাপন করতে পারেনা। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৫নং আয়াত: "সে কি মনে করে কেহ তার উপর জোর খাটাতে পারবেনা।" এসব করুন অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে, সে কি এ অহংকারের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে কেউ তাকে পাকড়াও করার কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থার পূবেই দুনিয়াতে দেখতে পাচ্ছে তার তাকদীরের উপর এমন এক শক্তির কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার সিদ্ধান্তের সামনে নিজের ও দুনিয়ার বড় বড় শক্তির কলা কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে অসহায়ভাবে সবকিছু মেনে নিতে হচ্ছে, এহেন মানুষের মাথায় যেমন করে এমন চিন্তা আসতে পারে যে, তার উপর কারো জোর খাটবেনা।

৬নং আয়াত: আমি প্রচুর ধন-সম্পদ গড়ে তুলেছি। আমি প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেছি, বলা হয়নি কারণ তার যে, বিপুল ধন-সম্পদ আছে সে তুলনায় যা খরচ করেছে তা সামান্য মাত্র, হিসেবে ধরা যায়না। অর্থাৎ তার ধন সম্পদের আধিক্যের অহংকার মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চায়। তাদের সম্পদ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয় বরং যে কাজে খ্যাতি বাড়বে, সুনাম বাড়বে, মানুষ তার প্রশংসা করবে, রাষ্ট্রশক্তি তাকে প্রশংসার গোনমা দিবে, ছেলের বিবাহে বিপুল অর্থ খরচ করবে, নিজে শত শত উট জবাই করে বন্ধুদের ভুরিভোজন করাবে, বিশ্বের বড় বড় শহরে বহুতল ভবন নির্মান করে,নির্বাচনে কুটি কুটি টাকা খরচ করে, সেজন্য তারা গৌরব করে বেড়ায়।

৭নং আয়াত: "সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?" অর্থাৎ গৌরব, অহংকার কারীকে দেখে না, মহা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক আল্লাহ একজন আছেন। তিনি দেখছেন সবকিছু এবং তিনিই মহাবিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। মানুষ যে সম্পদ উপার্জন করে, কোন কাজে ব্যয় করছে, কার স্বার্থে ব্যয় করছে এবং কিভাবে উপার্জ করছে তার প্রতিটি পাই পাই করে মহান আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে। তার অহংকার, খ্যাতি লাভের আকাঙ্খার কোন মূল্য কি লাভ করতে পারবে? পরকালে সে কি মনে করে দুনিয়ার মানুষ যেমন তার কাজে কর্মে প্রতারিত হয়েছে তেমন আল্লাহ প্রতারিত হবেন?

৮-৯নং আয়াত: "আমি কি তাকে দুটি চোখ, একটি জিহবা ও দুটি ঠোট দেইনি? অর্থাৎ আমি এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দিয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করেছি, মানুষের এসব পশুর বা গরু-ছাগলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয় বরং এগুলো ব্যবহার করে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে, গবেষণা করতে পারে, বিশ্বকে জয় করতে পারে, চিনতে পারে তার সৃষ্টিকর্তাকে"।

১০নং আয়াত: আমি কি দুটো স্পষ্ট পথ দেখাইনি? আমি মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়েই নিজের পথ খুজে নেয়ার জন্য ছেড়ে দেইনি। বরং তাকে সত্য, মিথ্যা, ভালো মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দুটি পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। ভাল মন্দ চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের সঠিক দায়িত্ব, কর্তব্য পালনের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন।

১১-১২নং আয়াত: কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জান সে দুর্গম পথটি কি? অর্থাৎ নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা। সহজ কাজটি হয় নিজের প্রবৃত্তির খায়েশ মোতাবেক মানুষের মধ্যে প্রসংশিত হওয়া, এমন কাজ করা যাতে মানুষ তাকে সকলের চেয়ে বড় মনে করে। আর অধিকাংশ মানুষ যা চায় সেও তাই সহজ কাজে, আনন্দের কাজে লিপ্ত থাকতে চায়। সম্পদশালী লোকেরা জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেমন খেলার আয়োজন, গানের, সিনেমার আয়োজন কিন্তু গরীব মানুষ সেখান থেকে কিছুই প্রত্যাশা করেনা। তাদের সহযোগিতার কোন আশা করেনা। যেমন স্টেডিয়ামে খেলা হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলা দেখে, পকেটে টাকা নিয়ে যেতে হয়, সিনেমাতেও তাই কিন্তু সেখানে গেইটে কোন ফকির, মিসকিন দেখবেন না সাহায্যের হাত পেতেছে কিন্তু মসজিদে জুমার দিন, ঈদের নামাজে অসহায় মানুষ ভীর জমায় কেন? কারণ নামাজ পড়ে রোজা রেখে যে চরিত্র গঠিত হয় তাতে অসহায় মানুষ কে সাহায্য করার মনোভাব জাগ্রত হয় এবং করেও তাই। কিন্তু খেলা দেখে, সিনেমা দেখে মানুষের মনে মানুষকে সাহায্য করার মনোভাব জাগ্রত হয়না তাই সেখানে অসহায় মানুষ ভীর জমায় না। এ হচ্ছে মানব রচিত নীতি ও আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য।

১৬ নং আয়াত: কোন দাসমুক্ত করা, অনাহারের দিন নিকটবর্তী এতিম বা ধুলিমলিন মিসকিনকে খাবার প্রদান করা। অর্থাৎ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য মানুষ যে অর্থের অপচয় করে, এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয় ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধপতন রোধ করে মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভাব নেই। বরং এজন্য মানুষকে প্রবৃত্তির উপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের

মহড়া দিতে হয়। তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা এবং আর্থিক সাহায্য করা, ঋণ মুক্ত করা, কোন অসহায় মানুষকে সাহায্য করা, অভুক্ত মানুষের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা, অসহায় ও মিসকিনের খাবার জন্য চেষ্টা করা। অসহায় ইয়াতিমের খোজখবর নেয়া।

এ ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজেনা, এদেরকে খাওয়ালে কারো ধন্যত্যাগ ও বদান্যতার তেমন কোন চর্চা হয়না। এসমস্ত কাজের কথা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বার বার এসেছ। এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এবং মহান আল্লাহ জান্নাত হাসিল করা যায়।

১৭ নং আয়াত: তারপর তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে যারা পরস্পরকে সবর ও রহম করার উপদেশ দেয়। উল্লেখিত গুণাবলির সাথে সাথে তার জন্য মুমিন হওয়া জরুরী। কারণ মুমিন ব্যতীত কারো নেক কাজ আল্লাহ কবুল করেন না। এ আয়াতে একটি ইসলামী সমাজ গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ দু'টো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

১ম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এ সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করবে অর্থাৎ একটি ধৈর্যশীল সমাজ হবে।

২য় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা পরস্পর রহম ও দয়া প্রদর্শন করবে। রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেনা" (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা:

১। সম্পদশালী লোকের অধিকাংশই সম্পদের অহংকারে মেতে উঠে।

২। সম্পদ যে মহান আল্লাহ দিয়েছেন তারা তা স্বীকার করতে চায়না বরং তারা মনে করে এ সম্পদ তাদের যোগ্যতা ও বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রবৃত্তির খায়েশ মিটাবার জন্য এ সম্পদ ব্যয় করা হয়ে থাকে।

৩। ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার রয়েছে তা ধনীরা স্বীকার করতে চায় না। অথচ আল কুরআনে এ অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে। "আল্লাহ বলেন, তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। (যারিয়াত-১৯)"

৪। কারখানা শিল্পের মালিকগণ শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে একটি কারখানার আয় দিয়ে কয়েকটি শিল্পের মালিক হয়। বিদেশে বাড়ী গাড়ির মালিক হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা যে বেতন পায় তাদিয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটে না। তাই তারা অর্ধাহারে-অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবনযাপন করে। আল্লাহর কাছে এ হচ্ছে জঘন্যতম অপরাধ।

৫। মহান আল্লাহ মিসকিনদের খাবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন আর এদেশের প্রতিটি শ্রমিক মিসকিনের মধ্যে শামিল। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে মিসকিনদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। মিসকিন হচ্ছে ঐসব লোক যারা কঠোর পরিশ্রম করে তারা যে মজুরী পায় তা দিয় তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়না অথচ তারা মানুষের কাছেও হাত পাতেনা। এ দেশের অধিকাংশ শ্রমিক মিসকিনের মধ্যে শামিল।

৬। একটি ইসলামী সমাজ গঠন করার কথা বলা হয়েছে। যে সমাজের মানুষ পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ ও মানুষের প্রতি দয়া দেখাবে। ইসলামী সমাজ না থাকলে, আল্লাহর বিধান কায়েম করা কঠিন।

৭। এ দেশের শ্রমজীবী মানুষকে যারা দ্বীনের পথে আনতে চায় তাদেরকে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশায় তাদের পাশে থাকতে হবে। তাদের উপর যে জুলুম হচ্ছে তার প্রতিবাদ করতে হবে। তাদের অধিকার আদায় করে দিতে হবে। তাদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে। তাদের চিকিৎসার ব্যবসস্থা করতে হবে। সর্বপরি তারা যেন অভুক্ত না থাকে সেজন্য তাদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। আল্লাহর এ বিধান যারা আন্তরিকতার সাথে পালন করবে তাদের জন্য জান্নাত আর যারা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন- তোমরা আমার কাছে দুনিয়ার শান্তি, কল্যাণ চাও এবং আখেরাতের কল্যাণ চাও। আসুন আমরা অসহায় মানুষদের দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করি। তাহলে তারা বিশ্বাস করবে আমরা তাদের আখেরাতের কল্যাণ ও কামনা করি।

রাসুল (সাঃ) মৃত্যুর মুহুর্তে বলে গেছেন- নামাজ, ও তোমাদের অধীনস্ত গোলাম অর্থাৎ নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিবে এবং তোমাদের অধিনস্ত কাজের লোকদের প্রতি যত্নবান হবে এবং অধিকার আদায় করে দিবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

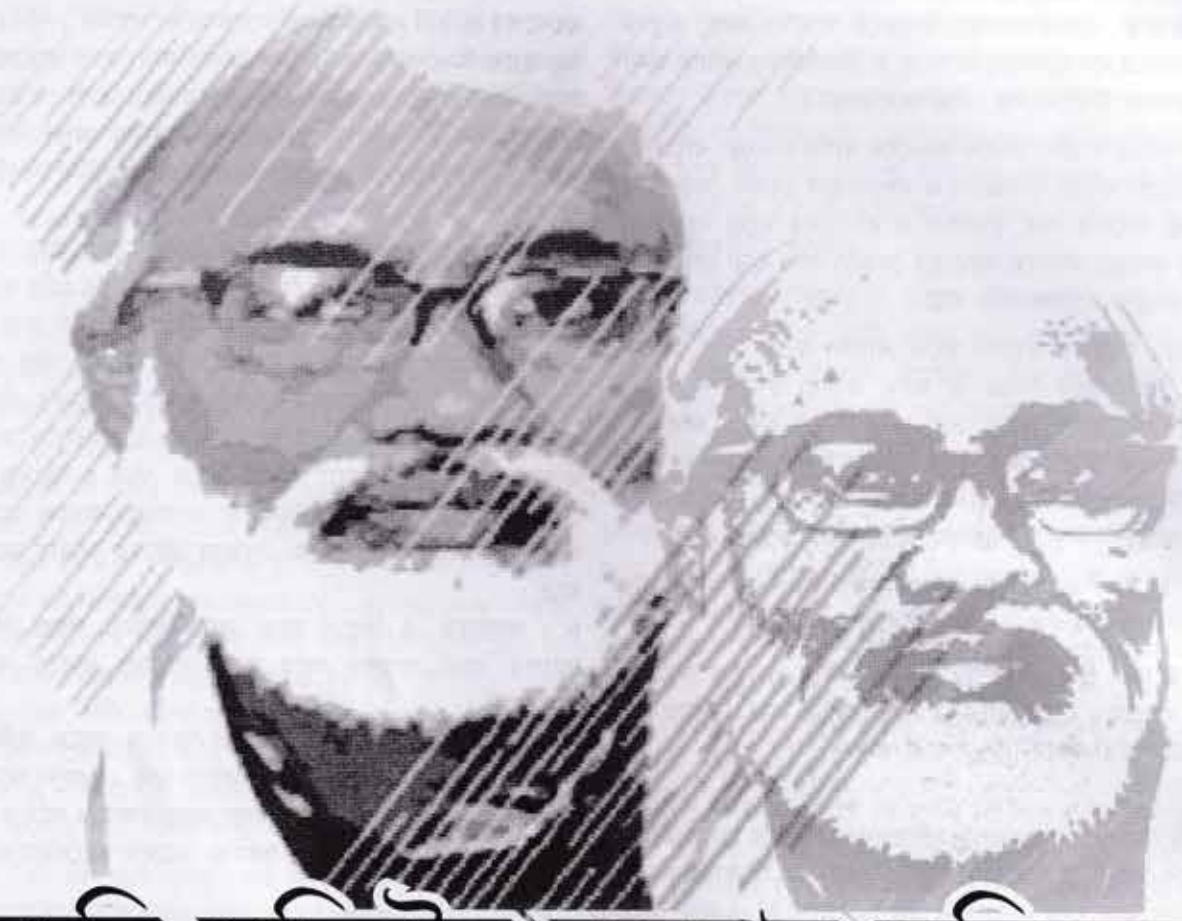

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে শ্রমজীবী মানুষ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

কবি মতিউর রহমান মল্লিক মূলত গণমানুষের কবি, মানবিক অনুসঙ্গের গীতিকার। দেশের শোষিত, বঞ্চিত নিপীড়িত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর হৃদয়আকাশ কেঁদে কেঁদে ওঠে। বুভুক্ষ মানুষের হাহাকার, বঞ্চিত জনতার আর্তচিৎকার, মজলুমের কষ্টের নোনাজল এবং সমস্ত আঁধারের জঞ্জাল সরিয়ে মুক্তির আলোর জন্য ছুটে চলেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি মজলুমের পাশে দাঁড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন তেমনি গান-কবিতা-ও ছড়া-প্রবন্ধেও তিনি তাদের সহায়-সাথী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামীণ জীবন থেকে শুরু করে শহুরে ইট-পাথরের সংস্কৃতিতেও শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে জুলুমবাজের শিকারে পরিণত হচ্ছে তা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ জুলুম-নির্যাতনের যেন কোন শেষ নেই বরং ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। তাইতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে উঠে এসেছে এমন সুর-

"নিপীড়িত মানুষের হাহাকার চিৎকার
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাড়ছে
জালিমের কালো থাবা বিষাক্ত লোলুপতা
স্বাধীনতা স্বাধীকার কাড়ছে।"

অন্য আরেকটি গানেও তিনি একই কথা তুলে ধরেছেন ভিন্ন ভাষায়–

"শহরের ফুটপাতে পল্লীর পথে ঘাটে
সবহারা মানুষ ঐ কাঁদছে
বেদনার কাল গুণে
আজাদীর জাল বুনে
বিপ্লবী কাফেলা ডাকছে।"

ভূপেন হাজারিকা, নচিকেতা এবং ফকির আলমগীরসহ অনেক শিল্পীকে

আমরা গণমানুষের শিল্পী বা মানবতাবাদী শিল্পী নামে আখ্যা দিয়ে থাকি। কবি সুকান্ত ভট্টচার্যকে বলা হয় প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনমানুষের কবি। তাদের লেখা ও সুরে উঠে এসেছে অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের আকুলতা। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান-কবিতা ও প্রবন্ধেও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা উঠে এসেছে মমতার আদরে মেখে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। অসহায় মানুষের আকুলতা তাঁকে আবেগে আপ্লুত করে তুলতো। শুধু তাঁর মানবিক হৃদয়টাই কেঁদে ফিরতো না, তাঁর গানও কেঁদে কেঁদে ওঠে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে।

"কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান-কবিতা ও প্রবন্ধেও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা উঠে এসেছে মমতার আদরে মেখে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। অসহায় মানুষের আকুলতা তাঁকে আবেগে আপ্লুত করে তুলতো। শুধু তাঁর মানবিক হৃদয়টাই কেঁদে ফিরতো না, তাঁর গানও কেঁদে কেঁদে ওঠে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে"।

তাইতো তিনি গেয়ে ওঠেন–
"গান আমার কাঁদেরে
প্রাণ আমার কাঁদেরে আজ আজ কাঁদে
মানুষের মুক্তি চেয়ে জীবনের স্বস্তি চেয়ে।
কেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ
কেন উঁচু নিচুর এতো বিদ্বেষ জেদ
হৃদয়ের ব্যথা ভার
সমাজের হাহাকার আজ আজ শুধু
ফেলিছে আকাশ ছেয়ে ফেলিছে বাতাস ছেয়ে।"

গানটির দ্বিতীয় ও শেষ অন্তরাতে তিনি বিশ্বময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ দিতে গিয়ে কষ্টের সাথে উচ্চারণ করেন–
"কেন হানাহানি চলে বিশ্বময়
কেন সত্যের আজো ঘটে পরাজয়
রাত কাটে মজলুমের
দুঃস্বপ্ন নির্ঘুমের হায় হায়রে
হতাশার চাবুক খেয়ে নিরাশার আঘাত পেয়ে
কেন সুখের সুদিন আজো আসে না
কেন ফুলের মত মানুষ হাসে না
বেদনার অশ্রু বয়
যাতনার অশ্রু বয় বয় কেন
গরিবের দুচোখ বেয়ে দুখিদের দুচোখ বেয়ে।"

এ রকম একটি গানের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়, কবি মতিউর রহমান মল্লিক আপাদমস্তক একজন মানবতাবাদী কবি। শুধু এমন একটি গান নয়, অসংখ্য কবিতা ও গানে তিনি মানবতার কথাই গেয়ে গেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানই তাঁকে একজন খাঁটি মানবতাবাদী কবি-গীতিকার ও শিল্পী হিসেবে সমুজ্জ্বাল করে রাখতে সক্ষম। তবে এসব শিল্পী-কবিদের সাথে মতিউর রহমান মল্লিকের তফাৎ হচ্ছে যে অন্যান্য কবিরা আকুলতাগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করলেও সংকট সমাধানে যৌক্তিক কোন মতাদর্শ উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। তারা উপস্থাপন করেছেন মানুষের মনগড়া মতবাদ। সত্যিকার মুক্তির জন্য 'ইসলামের বিজয় অনিবার্য'। তাই কবি মতিউর রহমান মল্লিক মানবতার মুক্তির চিরন্তন দর্শন 'ইসলামের' সুমহান আদর্শকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পীত ঢঙে। ইসলামের মুক্তিদর্শনের বাস্তবায়নেও তিনি রাসূলের (সাঃ) পদাংক অনুসরণ করে সাংগঠনিক অবয়বদানেরও দীক্ষা দিয়েছেন। তাইতো তিনি সত্যিকার অর্থে মানবতাবাদী ও শক্তিশালী বিশ্বাসী কবি। কবি মল্লিক তাঁর গানে উল্লেখ করেন–
"আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই
দাবানল জ্বালাবার মন্ত্রে

বজ্রের আক্রোশে আঘাত হানি
মানুষের মনগড়া তন্ত্রে ।"
এ গানের প্রথম অন্তরা, সঞ্চারী ও শেষ অন্তরাতে ইসলামের বিজয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক-
"এসো বন্যার খর তেজ মাড়িয়ে
এসো উল্কার ক্ষিপ্রতা ছাড়িয়ে
নির্দয় নির্মম আঘাত হানি
তাগুতের সব ষড়যন্ত্রে ।
তৌহিদী বিপ্লব দিকে দিকে আনো আজ
শান্তির সয়লাব বুকে বুকে দানো আজ
এসো সত্যের সূর্যটা উদিয়ে
এসো জেহাদের সঙ্গীন উচিয়ে
প্রলয়ের হুংকারে ধ্বংস আনি
বাতিলের সব ষড়যন্ত্রে ।"

সত্যের বিজয় আনতে হলে সহ্য করতে হয় অনেক কষ্ট, পার হতে হয় অনেক ঘাত-প্রতিঘাত; কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিষয়টি ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি সমস্ত দুর্যোগ, কষ্ট ও বাঁধার প্রাচীর ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সাথে নিয়ে যেতে চান বিশ্বস্ত সাথীদেরও-

"ঘন দুর্যোগ পথে দুর্ভোগ
তবু চল তবু চল
পাহাড় বনানী পেরিয়ে সেনানী
ভাঙ্গ মিথ্যার জগদ্দল" ।

অন্য আরেকটি গানেও তিনি একই আহ্বান জানিয়েছেন–
"এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে জাগতেই হবে তোমাকে
জীবনের এই মরু বিয়াবানে
প্রাণ আনতেই হবে আনতেই হবে তোমাকে ।"

গানটির প্রথম অন্তরাতে তিনি এ যাত্রার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন–
"জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৌহিদী হিল্লোল
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য উঠাতেই হবে উঠাতেই হবে তোমাকে ।"

কবি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পাদিত গ্রন্থ 'সুর শিহরণ' থেকে শুরু হয়েছে গানগুলো মলাটবদ্ধ হওয়া। তাঁর মাত্র কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে শতাব্দী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় মল্লিকের একক গানের বই 'ঝংকার'। প্রায় অর্ধশতকের বেশি গান নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের বড় ভাই কবি মল্লিক আহমদ আলী, ক্বারী রুহুল আমিন এবং কবিবন্ধু মতিয়ার রহমানকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো সারাদেশের ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠীর খোরাক হিসেবে অতিদ্রুত ছড়িয়ে যায়। আর ঝংকার এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বিশেষকরে মফস্বল অঞ্চলের মাদরাসা, স্কুল, কলেজ-এ পড়ুয়া ইসলামী ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ছাত্র/ছাত্রী কিংবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, স্কুল-কলেজ- মাদরাসার শিক্ষক, মাহফিলের বক্তা ও ওয়ায়েজিন মহোদয়গণ তাঁর এ গ্রন্থকে পুঁজি করেই গান গেয়েছেন। সুরের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে কবির

সত্যের বিজয় আনতে হলে সহ্য করতে হয় অনেক কষ্ট, পার হতে হয় অনেক ঘাত-প্রতিঘাত; কবি মতিউর রহমান মল্লিক বিষয়টি ভালোভাবেই জানেন। তাই তিনি সমস্ত দুর্যোগ, কষ্ট ও বাঁধার প্রাচীর ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সাথে নিয়ে যেতে চান বিশ্বস্ত সাথীদেরও-
"ঘন দুর্যোগ পথে দুর্ভোগ
তবু চল তবু চল
পাহাড় বনানী পেরিয়ে সেনানী
ভাঙ্গ মিথ্যার জগদ্দল" ।

স্বকণ্ঠে গাওয়া একক এ্যালবাম 'প্রতীতি-১' এবং 'প্রতীতি-২'। গ্রামীণ জনপদে রেকর্ড প্লেয়ার কম থাকলেও গানগুলো মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষত ঈদগাহে, ওয়াজ মাহফিলে, মিলাদ মাহফিলে, ইসলামী দিবস পালন অনুষ্ঠানে এমনকি মাদরাসা-মক্তব ও স্কুল কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যে প্রেক্ষিতেই 'ঝংকার' এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে এবং ১৯৯৬ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় সংস্করণ। এরপর কবির একক গান নিয়ে প্রকাশিত হয় 'যত গান গেয়েছি।' এটি ইসলামী গানের এক বৃহৎ সংকলন। মূলত এ সংকলনটি প্রকাশিত হবার পরপরই মতিউর রহমান মল্লিক একজন সেরা গীতিকার হিসেবে জনন্দিত হয়ে ওঠেন। সেই সাথে ২০১১ সালের মার্চ মাসে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গীতিকাব্য 'প্রাণের ভেতরে প্রাণ'। শিল্পী হামিদুল ইসলামের ঝকঝকে প্রচ্ছদের এ গ্রন্থটির স্বত্ব যথাযথভাবে সাবিনা মল্লিককে দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও শিল্পী আব্বাস উদ্দীনকে। চার ফর্মার অফসেট কাগজে ছাপা এ বইটির মূল্য রাখা হয়েছে একশত টাকা। এখানেও উনপঞ্চাশটি গীতি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে যার প্রায় সবগুলোই নতুন গান। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানগুলো সর্বমহলে বিশেষত আদর্শিক চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে সামান্য সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এর বিবিধ কারণ ছিল–

প্রথমত: মানুষ স্বভাবগতভাবেই আদর্শিক বিষয়ের প্রতি স্পর্শকাতর। আল্লাহ-রাসূল, ইসলামের সুমহান আদর্শিক কথা সম্বলিত বাণীর প্রতি প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়ের টান থাকে বিশ্বাসের কারণেই। সে কথাগুলো যদি সুরেলা কণ্ঠে, উন্নত ভাষায় ও আকর্ষণীয় ঢঙে পরিবেশন করা হয় তাহলে মানুষের হৃদয় কাড়বে অবলীলায়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান সে কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা মল্লিকের গানে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলের প্রশংসা, স্বদেশের কথা, মানবতার কথা, দুনিয়া ও আখিরাতের কথা উঠে এসেছে একেবারে আধুনিক ভাষায়, হৃদয়গ্রাহী সুরে। তাঁর বিশ্বাস অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং ইসলামের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার কারণে তাঁর কোন গানেই শির্কের মিশ্রণ ঘটেনি। সেইসাথে শব্দ চয়নে কবি মল্লিক ভীষণ সুকৌশলী ছিলেন। যে গানে যেমন ভাষা দরকার সে গানে তেমন ভাষাই ব্যবহার করেছেন তিনি। অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সহজ-প্রাঞ্জল ভাব-ভাষা তাঁর গানকে মানুষের কাছে অতিদ্রুত সমাদৃত করেছে।

দ্বিতীয়ত: মতিউর রহমান মল্লিক একজন সফল গীতিকবি। গ্রামীণ জনপদে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পরিণত বয়সে রাজধানী শহরের জীবনযাত্রা তাকে বৈচিত্রময় জ্ঞানের অধিকারী করে তুলেছে। তাঁর গানের পরতে পরতে বৈচিত্রময় উপমার সমাবেশ ঘটেছে। যে গানে যে ধরনের উপমার প্রয়োজন সে গানে সে ধরনের যুতসই উপমাই তিনি ব্যবহার করেছেন। গ্রামীণ ঐতিহ্য, ফুল-পাখি প্রকৃতি, বৃক্ষের সজীবতা, নদীর কলতান, উদার আকাশ, ঝর্ণার গান, শহুরে জৌসুল-খরা, মানবতার জীবনবোধ, জাহিলিয়াতের রক্তচক্ষু, মুমিনের রহম দিল সবকিছুই তাঁর গানে সাবলিলভাবে এসেছে। সে কারণে মল্লিকের হামদ-নাত, ইসলামী গান ও জীবনমুখী গানগুলো ভীষণভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত: বিষয়বস্তুর সাথে কালকে ধারণ করা একজন বড় কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের উপযোগিতাকে পুরোপুরিভাবে ধারণ করে তা ভাষা ও উপমার লালিত্যে কালজয়ী করে তোলা একজন প্রতিষ্ঠিত কবির পক্ষেই সম্ভব। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তা স্বার্থকভাবেই করেছেন।

"কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। তিনি নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং স্বকণ্ঠে তা ছড়িয়ে দিতেন। হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে গাওয়া তাঁর দরদভরা কণ্ঠের গান শুনে সমস্ত জনপদের মানুষ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আল্লাহ-রাসূলের প্রেমে গদগদ হয়ে উঠতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এক অসাধারণ সমন্বয়ের আহ্বানে মুমিন হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে তাঁর গানে। তাঁর কণ্ঠও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এ প্রসঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি জীবনের নিকটতম সহযাত্রী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর মন্তব্য করেন– 'যিনি গান লেখেন তিনি নিজে সুর সাধারণত কমই দেন আর নিজ কণ্ঠে তার ধারণ খুব কম দেখা যায়"।

সময়ের সব বড় বড় বাধাগুলো- যা জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে তা ফিরে আসে আবার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। কবি মল্লিক আঙ্গিকগুলো ভালোভাবে রপ্ত করে সুকৌশলে তা গানে প্রয়োগ করেছেন। যে কারণে তাঁর গান হয়ে উঠেছে কালজয়ী ও হৃদয়গ্রাহী।

চতুর্থত: সুর হচ্ছে গানের প্রাণ। কথার সাথে সুরের সঠিক সমন্বয় হলেই গান হৃদয়গ্রাহী হয়– গানটি হয়ে ওঠে কালজয়ী। মতিউর রহমান মল্লিক নিজে যেমন লিরিক লিখেছেন তেমনি সুরও করেছেন অধিকাংশ গানে। এছাড়া যেগুলো তিনি সুর করেননি তাঁর একটি বৃহত্তম অংশের গানে সুর দিয়েছেন বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী মশিউর রহমান। এছাড়া অনেক তরুণ প্রবীণ সুরকারগণ তাঁর গান নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর গানগুলো নানা আঙ্গিকে বৈচিত্রময়তার সাথে সাথে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পঞ্চমত: "কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। তিনি নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং স্বকণ্ঠে তা ছড়িয়ে দিতেন। হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে গাওয়া তাঁর দরদভরা কণ্ঠের গান শুনে সমস্ত জনপদের মানুষ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আল্লাহ-রাসূলের প্রেমে গদগদ হয়ে উঠতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এক অসাধারণ সমন্বয়ের আহ্বানে মুমিন হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে তাঁর গানে। তাঁর কণ্ঠও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এ প্রসঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি জীবনের নিকটতম সহযাত্রী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর মন্তব্য করেন– 'যিনি গান লেখেন তিনি নিজে সুর সাধারণত কমই দেন আর নিজ কণ্ঠে তার ধারণ খুব কম দেখা যায়"। কবি মল্লিক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কলম যেমন ছিলো শাণিত ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তাঁকে মধুর একটা কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মিডিয়াতে যে ধরনের কণ্ঠ আমরা সবাই সাধারণভাবে শুনে অভ্যস্ত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কণ্ঠ ছিলো তাঁর। এক ধরনের মায়াময় পরিবেশ তৈরি করতো। শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো তাঁর কণ্ঠ। তিনি নিজে খুব যে বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তা নয় তবে যে কয়টি এ্যালবাম আছে তার ব্যাপক কাটতি সে সত্যতারই প্রমাণ বহন করে।'

ষষ্ঠত: বহু ভাষাবিদ না হলেও বিভিন্ন ভাষার উপর দখল ছিল কবি মতিউর রহমান মল্লিকের। মাতৃভাষা ও কবি পরিবারের প্রিয় ভাষা হিসেবে বাংলার উপর তাঁর যেমন দখল ছিল তেমনি আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষার উপরও ছিল তাঁর আধিপত্য। ইংরেজি ভাষা চর্চাও তিনি পছন্দ করতেন। সে দৃষ্টিতে তাঁর কবিতা ও গানে অন্যান্য ভাষার প্রভাব কম থাকলেও সেসব ভাষার সাহিত্যকে তিনি হজম করে খুব সহজে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করতেন। গান নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে আগ্রহী ছিলেন। যে কোন দেশের ও ভাষার গান তিনি শুনতে পছন্দ করতেন। যেসব গান তাঁর হৃদয় কাড়তো, সেসব গান তিনি কখনো হুবহু আবার ভাবগতভাবে অনুবাদও করতেন। অনেক উর্দু, আরবি ও ফার্সি গানের অনুবাদ তিনি সফলভাবে করেছেন। ছন্দের হাত ছিল তাঁর ভীষণ দক্ষ। যে কারণে তাঁর প্রতিটি গান যেন এক একটি কবিতা। ছন্দ, মাত্রা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বিষয়বস্তুর অসাধারণ সমন্বয়ে গানগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সপ্তমত: মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর গানের একটি বৃহত্তম বলয় তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে নিজের কণ্ঠে তিনি সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গান শুনিয়েছেন। সেইসাথে সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর মতো অসংখ্য শিল্পীগোষ্ঠী তিনি সারাদেশে তৈরি করেছিলেন যারা তাঁর গানগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে সারাদেশে। এছাড়াও বিভিন্ন অডিও- ভিজুয়্যাল ক্যাসেট, সিডি-ভিসিডি তাঁর গানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। যে কারণে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলসহ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতাসমূহে অদ্যাবধি কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান সবচেয়ে বেশি গাওয়া হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে প্রচলিত হামদ-নাত ও ইসলামী গান মানেই ভক্তিমূলক গানকেই বুঝানো হতো। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতেও এ ধরনের গানকে ভক্তিমূলক গান হিসেবে প্রচার করা হয়ে থাকে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতার স্বাদ ছড়ালেও কবি মতিউর রহমান মল্লিক এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হয়েছেন। ইসলামের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা ও শিক্ষাকে তিনি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি কখনো মানবতার দুর্গতি থেকে উত্তরণের জন্য, সামাজিক সম্প্রিতি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবিকতার বিকাশের জন্য, নৈতিকতা গঠনের জন্য; সর্বোপরি দীন প্রতিষ্ঠার ফরজিয়াতকে তিনি গানের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে মুমিন হৃদয়ে সর্বোচ্চ ও স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানে যেমন আলিম-উলামা শ্রেণি মেতে উঠেছেন তেমনি তাঁর গানকে উল্লাসিত হৃদয়ে কণ্ঠে ধারণ করেছেন বিশ্বাসী ঘরানার সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীরা। এমনকি কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ জনতাও তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছেন এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই তো কবি হারুন ইবনে শাহাদত তাঁর কবিতার একটি পংক্তিতে উল্লেখ করেন- 'তোমার গানে জেগেছে কৃষক, জেগেছে শ্রমিক, জেগেছে ছাত্র জনতা।' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান-কবিতা ও প্রবন্ধেও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা উঠে এসেছে মমতার আদরে মেখে। গড়তে গড়তে একদিন সে গান আলোকিত করবে গোটা সমাজ, সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবী- এ প্রত্যাশা কোন উচ্চাভিলাষ নয়, বাস্তবতার নিরিখেই এ কথা বলা যায়। তাইতো তার অনুপস্থিতিতে আমাদেরকেই ধরতে হবে সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধতার হাল। কবির ভাষায়-

"এখানে এখনও জাহেলী তমুদ্দন
শিকড় গাড়ার প্রয়াসে যে তৎপর
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর।"

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদর্শ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতি

লস্কর মুহাম্মদ তসলিম

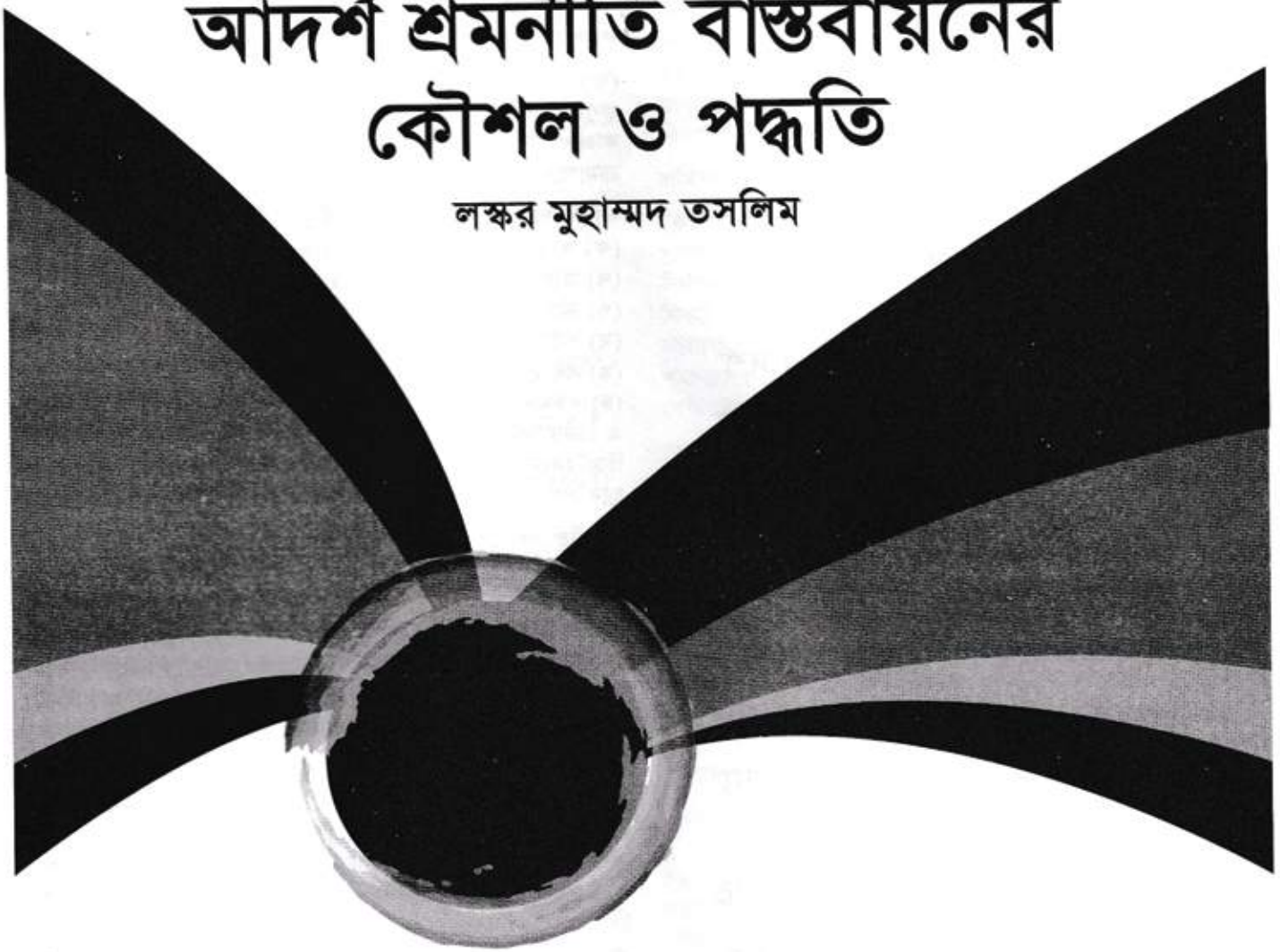

পূর্ব সংখ্যার পরে

শিক্ষা প্রশিক্ষণ কৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে আদর্শ শ্রমনীতির বাস্তবায়ন: "ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের অধীনে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের আদর্শিক জ্ঞান এবং আদর্শ চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলে আদর্শ শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। "আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আগ্রহী শ্রমিকদের যোগ্যতা সম্পন্ন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ অর্থাৎ সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। একদল শ্রমিককে শুধু সংঘবদ্ধ করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। প্রকৃতপক্ষে এখানেই আমাদের কাজ শুরু। যারা আমাদের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিবেন তাদেরকে আদর্শ শ্রমনীতি বিষয়ক জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা যুক্তি প্রয়োগে ইসলামী শ্রমনীতিকে বাস্তব আদর্শ হিসাবে বুঝাতে পারেন এবং পেশ করতে পারেন। তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা চারিত্রিক মাধুর্যের অধিকারী হতে পারেন। প্রত্যেকে যেন আদর্শের আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তুলে শ্রমিকদের সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে এবং ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়েও যেন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকতে পারেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতা, খাদ্যপুষ্টি, চিত্তবিনোদমুলক প্রোগ্রামের আয়োজন করে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। এর সাফল্যজনক বাস্তবায়নের উপরই ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি, সাংগঠনিক মজবুতি, কর্মী ও নেতা তৈরী নির্ভরশীল। কৌশল ও পদ্ধতি হিসাবে নিম্নোক্ত কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে-গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা,আদর্শ শ্রমনীতি বিষয়ক সাহিত্য পাঠ ও বিতরণ,বই পাঠ, আলোচনা সভা, সামষ্টিক অধ্যয়ন ইত্যাদি, প্রশিক্ষণ শিবির, শিক্ষা বৈঠক, নৈশ ইবাদত, সামষ্টিক ভোজ,ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ,দোয়া ও নফল ইবাদত, গঠনমুলক সমালোচনা, পরামর্শ, আত্মসমালোচনা বা নিজ কাজের পর্যালোচনা, কুরআন তালিম/কুরআন ক্লাস।

আদর্শ শ্রমনীতির আন্দোলন ও শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কৌশল ও পদ্ধতি: "আদর্শ শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার উদ্দেশ্যে আদর্শ শ্রমনীতির ভিত্তিতে শ্রমনীতির পরিবর্তন সাধনের দাবীতে সংগ্রাম এবং শ্রমিক সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের আন্দোলন বা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নেরর কৌশল ও পদ্ধতি থাকতে হবে:-

(ক) আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং (খ) শ্রমিক সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান। নিম্নে এ দুটি কাজের কৌশল ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হল-

(ক) আদর্শ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম: আমাদের বর্তমান শ্রমব্যবস্থা জুলুম শোষনে জর্জরিত। তাই এই অবস্থায় আদর্শ শ্রমনীতি প্রবর্তনের কাজ রাতারাতি হওয়া সম্ভব নয়। এ কাজ ক্রমিক পর্যায়ে করতে হবে। ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে হবে।

আদর্শ সংগঠক ও কর্মীদের প্রথমত জেনে নিতে হবে
(ক) আদর্শ শ্রমনীতি বলতে কি বোঝায়?
(খ) আদর্শ শ্রমনীতির বৈশিষ্ট্য কি কি?
(গ) আদর্শ শ্রমনীতি কিভাবে প্রবর্তন করা যায়?
(ঘ) বর্তমান প্রচলিত শ্রমনীতির দোষ-ত্রুটি কি কি?
(ঙ) এর সুদূরপ্রসারী ফল কি?
(চ) বর্তমান শ্রমনীতির মৌলিক গলদ কোথায়? ইত্যাদি।
এ জন্য প্রকাশিত শ্রমিক বার্তা ও অন্যান্য প্রকাশনী ও বিভিন্ন চিন্তাবিদদের আদর্শ শ্রমনীতির উপর লিখিত বইগুলো পাঠ করতে হবে।

"দ্বিতীয় পর্যায়ে- আমাদেরকে আদর্শ শ্রমনীতি সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকদের মতামত সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক সমাজ, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, চিন্তাশীল নাগরিকদের বর্তমান শ্রমনীতির কুফল অবগত করিয়ে আদর্শ শ্রমনীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনিয়তা বুঝাতে হবে। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আলোচনা, সাময়িকী, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি বিতরণ করতে হবে। এছাড়া শ্রমিক মতবিনিময় মিটিং, গোলটেবিল মিটিং, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন, অবস্থা বুঝে করা যেতে পারে"।

তৃতীয় পর্যায়ে- অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় নির্দিষ্ট সময়ান্তে শ্রমনীতি সম্পর্কে পোস্টারিং, পত্রিকায় বিবৃতি, পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে লেখা, আদর্শ শ্রমনীতির দাবীতে দিবস ও সপ্তাহ পালন প্রভৃতি করা যেতে পারে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়ে পত্রিকায় দিতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব না হলে পরোক্ষভাবে কাজ করা যেতে পারে।

চতুর্থ পর্যায়ে- বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের নিকট আবেদন করতে হবে আদর্শ শ্রমনীতির পরিকল্পনা পেশ করার জন্য। একই মনোভাবাপন্ন শিক্ষাবিদদেরও আহ্বান করতে হবে, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বই ইত্যাদির মাধ্যমে আদর্শ শ্রমনীতির রূপ শ্রমিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে তুলে ধরার জন্য।

পঞ্চম পর্যায়ে- আদর্শিক কর্মীদের লিখিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সহকারে আদর্শ শ্রমব্যবস্থার উপর বিশেষ সংকলন বের করার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আদর্শ শ্রমব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। তাই এ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আদর্শ শ্রম ব্যবস্থার পরিবর্তনই আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য পৌঁছার হাতিয়ার মাত্র। আমাদের স্থায়ী উদ্দেশ্য হতে হবে সকল প্রচেষ্টার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

(খ) শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান: "অর্থাৎ শ্রমিকদের যুক্তিসংগত দাবী-দাওয়া পুরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ও তাদের অভাব-অভিযোগ দুরীকরণে এগিয়ে আসা। এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। শ্রমিক বলে তাদের প্রতি অমনোযোগি থাকা যাবে না। শ্রমিকদের যাবতীয় ন্যায়সংগত সমস্যা সমাধানে আমাদের অগ্রণী হতে হবে। সমস্যা

"দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদেরকে আদর্শ শ্রমনীতি সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকদের মতামত সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক সমাজ, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, চিন্তাশীল নাগরিকদের বর্তমান শ্রমনীতির কুফল অবগত করিয়ে আদর্শ শ্রমনীতির ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনিয়তা বুঝাতে হবে। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আলোচনা, সাময়িকী, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি বিতরণ করতে হবে। এছাড়া শ্রমিক মতবিনিময় মিটিং, গোলটেবিল মিটিং, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন, অবস্থা বুঝে করা যেতে পারে"।

সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। এক সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে আরও দশটি সমস্যার সৃষ্টি করা আমাদের কাজ নয়। আমরা নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচীর মাধ্যমে গঠণমূলক প্রচেষ্টার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কোনপন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী নই"।

শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে আমাদের কর্মসূচি নিম্নরূপ-হতে হবে

(ক) আমরা প্রথমে সমস্যার কারন নির্ণয় করতে চেষ্টা করব। গোড়ায় গলদ থাকলে শাখা-প্রশাখা নিয়ে হৈ-চৈ করে লাভ নেই। কারণ নির্ণয়ের পর যথাসম্ভব মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট ডেলিগেট প্রেরণ, স্মারকলিপি প্রদান, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, স্বাক্ষর অভিযান চালিয়ে কর্তৃপক্ষকে সমস্যা সমাধানের যৌক্তিকতা ও পন্থা বুঝাতে চেষ্টা করব। আমাদের বিশ্বাস, বেশীরভাগ সমস্যাই এভাবে সমাধান করা যায়।

(খ) যদি উপরোক্ত উপায়ে সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা না হয় তাহলে প্রতিবাদ সভা, নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ, পোস্টারিং, পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান প্রভৃতি উপায়ে আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করব।

(গ) উপরোক্ত দু'উপায়ের পরও যদি কর্তৃপক্ষ অনমনীয় থাকেন, তখন আমরা প্রতীকি ধর্মঘট পালন ও সুশৃঙ্খল আন্দোলনের মাধ্যমে এসব দাবি আদায়ের চেষ্টা করব। আমরা নিশ্চিত যে, উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ে চেষ্টা করলে কোন সমস্যা সমাধান ছাড়া থাকতে পারে না। যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে কর্তৃপক্ষ গঠণমুলক আলোচনা চান না অথবা সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি বা কতিপয় লোকের স্বার্থ ত্যাগ করতে নারাজ। এহেন মুহূর্তে অবস্থার দাবী অনুযায়ী আমাদেরকে আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাচন: অসৎ নেতৃত্বের অপসারন ও সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ছাড়া দুনিয়াতে আদর্শ সমাজ বিনির্মান সম্ভব নয়। তাই শ্রম প্রতিষ্ঠানগুলোর চত্বরেও আমাদের অনার্দশিক নেতৃত্ব অপসারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিল্প, কারখানার, সিবিএ নির্বাচনে ভূমিকা নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শ্রমিক নেতৃত্বের ব্যাপারে কোন বক্তব্য না থাকার অর্থ আদর্শের কোন প্রভাব না থাকা। সন্যাসী বা বৈরাগির মত সাধারণত আমরা ভোটদান বা নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে পারি না। আমাদেরকে ভোট দিতে হবে। নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে কিন্তু কাকে ভোট দিব? যেহেতু আমরাও আন্দোলন করছি তাই আমাদেরকে হয় নিজেদের কর্মী কে প্রার্থী করাতে হবে নতুবা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যক্তিকে সমর্থন দিতে হবে।

নির্বাচনে আমাদের নীতি: (ক) শ্রম প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মূল কাজের পরিমাণ যাচাই করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ কর্মী সংখ্যা, সমর্থক সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনা করে আমাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(খ) শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ আমাদের কাজ নয়। নির্বাচনের আগেও আমাদেরকে মৌলিক বা বুনিয়াদী কাজ করতে হবে।

(গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে।

(ঘ) সভাপতি বা দায়িত্বশীল কর্মীগণ কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ঠিক না। মনে রাখতে হবে মূল আদর্শের কাজের ক্ষতি সাধন করে নির্বাচনে অযথা জড়িয়ে পড়ার পরিণতি মারাত্মক।

> **"অর্থাৎ শ্রমিকদের যুক্তিসংগত দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ও তাদের অভাব-অভিযোগ দুরীকরণে এগিয়ে আসা। এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। শ্রমিক বলে তাদের প্রতি অমনোযোগি থাকা যাবে না। শ্রমিকদের যাবতীয় ন্যায়সংগত সমস্যা সমাধানে আমাদের অগ্রণী হতে হবে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। এক সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে আরও দশটি সমস্যার সৃষ্টি করা আমাদের কাজ নয়। আমরা নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে গঠণমূলক প্রচেষ্টার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কোনপন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী নই"।**

> “অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য আদর্শ সমাজ বিনির্মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো”। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে । শ্রমিক সমাজ নিয়েই আমাদের আন্দোলন। একটি দায়িত্বশীল শ্রমিক সংগঠন হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে আমাদের তৎপরতাকে একাকার করে দিতে পারি না। তাই বলে জাতীয় সংকটের মুহূর্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি না”।

আদর্শ শ্রমবান্ধব সমাজ বিনির্মাণ: “অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো”। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে, শ্রমিক সমাজ নিয়েই আমাদের আন্দোলন। একটি দায়িত্বশীল শ্রমিক সংগঠন হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে আমাদের তৎপরতাকে একাকার করে দিতে পারি না। তাই বলে জাতীয় সংকটের মুহূর্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি না। এর অর্থ এই নয় যে সাধারণ অবস্থায় আমরা জাতীয় সমস্যা থেকে দূরে থাকি। আত্মসচেতনতার সাথে আমরা জাতীয় সমস্যা অবলোকন করি এবং তা দূর করতে বলিষ্ঠ ও গণমুখী ভূমিকা পালন করি। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদর্শিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ ব্যাপারে সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বাস্তব এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দু'ভাবে আমরা এ দফার কাজ করে থাকি।

(১) প্রথমত:

(ক) আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ মুখের কথায় বা স্লোগানের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গঠন।

(খ) নেতৃত্ব তৈরী: সঠিক নেতৃত্বের অভাবেই জাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সাধন তো দূরের কথা জাতির সাধারণ কোন কাজও সঠিক নেতৃত্ব ব্যতিরেকে সু-সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এজন্য নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন কর্মীদেরকে সংগঠনের যাবতীয় তৎপরতা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবমুখি পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদেরকে এ প্রয়োজন পূরন করতে হবে। তাই কর্মী নিজে অথবা সংগঠনের পরামর্শে যে কোন একটি ট্রেডকে টার্গেট করে নেবে। তারপর উক্ত বিভাগের একজন এক্সপার্ট হিসেবে গড়ে উঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

(গ) কর্মী তৈরি: আদর্শ শ্রমনীতির সমাজ বিনির্মানের জন্য একদল সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। এ সংগঠন তার যাবতীয় তৎপরতার মাধ্যমে উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণ করতে চায়। অতএব সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম যথার্থভাবে মেনে চলাই এক্ষেত্রে আমাদের কাজ।

(ঘ) জ্ঞান অর্জন: শ্রমিক অধিকার আদায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে এতদসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করাকেই আমদের প্রাধান্য দিতে হবে, নিম্নোক্ত দিকগুলোকে সামনে রেখে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সর্ব প্রথম চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের থাকতে হবে। জাতীয় চরিত্রের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ আমাদের উদঘাটন করতে হবে এবং সমাধানের সঠিক পথ জানতে হবে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকতে হবে। ইতিহাস, ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বর্তমান গতিধারার উৎস খুঁজে বের করতে হবে। শ্রমিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত দল সক্রিয় আছে তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাদের কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা ক্ষতিকর তা বুঝতে হবে। শ্রমিক সমস্যার সঠিক সমাধান কি, এ সমাধান কোন পথে আসতে পারে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শ্রমনীতির সমস্যার গতিধারা ও রূপরেখা জানাও আমাদের প্রয়োজন। বর্তমানে যে ধরনের শ্রমনীতি চালু আছে মূল ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া বিভিন্ন শ্রমনীতির সমস্যা সমাধানে সঠিক পথ ও পন্থা ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। সাংস্কৃতিক গোলামীর ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের বাস্তবমুখী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি কি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালু আছে তার উৎস, রূপ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কোথায় কোন পদ্ধতি কোন নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আঘাত হানলে সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে আমরা মুক্তি পাব তা যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা

আতিকুর রহমান

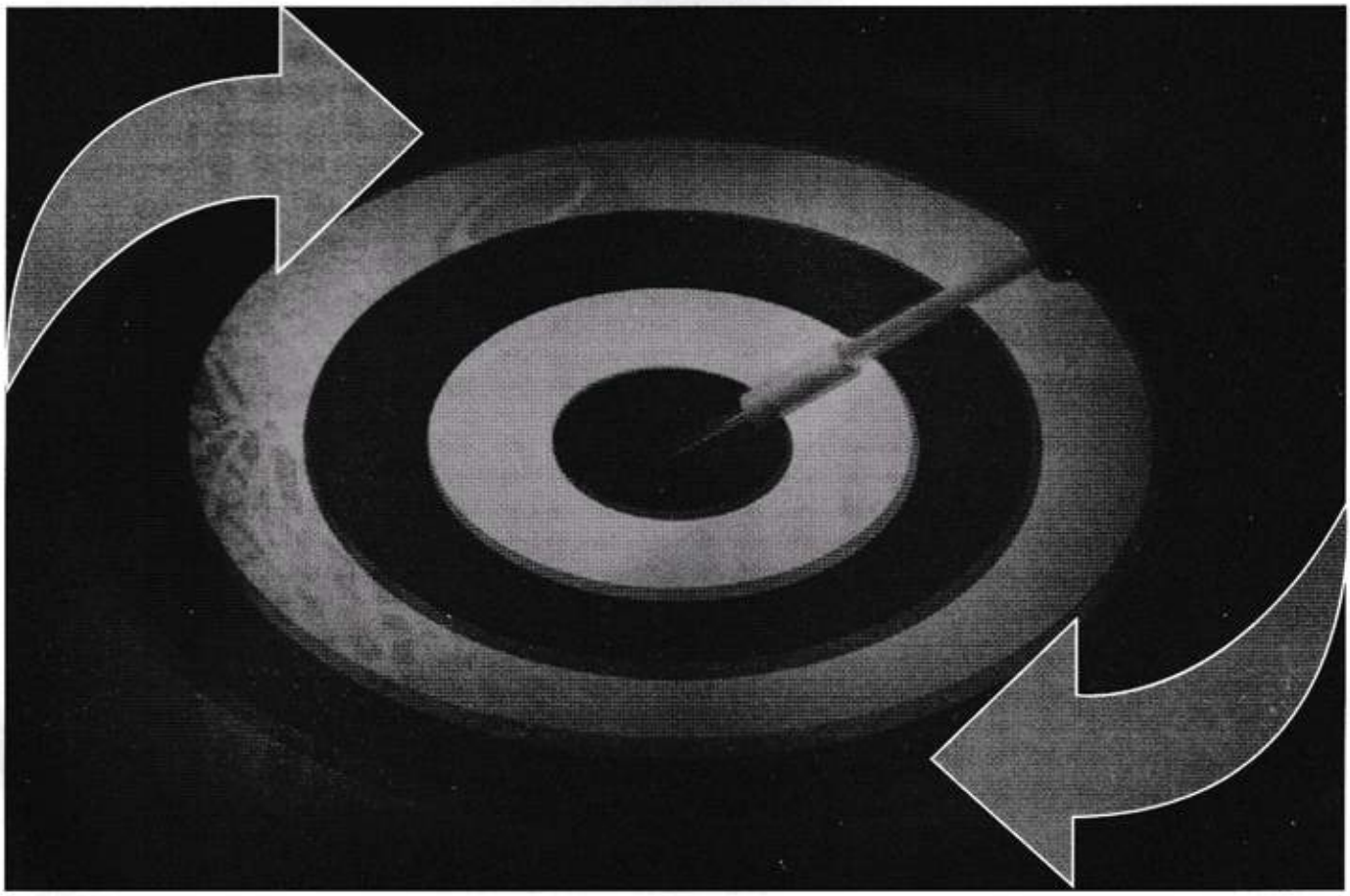

আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন বলতে কি বুঝায়/আদর্শ ট্রেড ইউনিয়নের মানদন্ড

১. আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন হবে দ্বীনি মানসম্পন্ন।

২. প্রতিটি ইউনিয়নের ইসলামী আন্দোলনের শক্তিশালী ফিল্ড হিসাবে ভূমিকা পালন।

৩. ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে থাকা/তৃণমূল পর্যন্ত ইউনিয়নের কার্যক্রম বিস্তৃত থাকবে।

৪. মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে।

৫. শ্রমজীবি মানুষের নিকট আস্থাশীল হবে।

৬. নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা হবে। A set of leadership থাকবে।

৭. সাংগঠনিক শৃংখলা বজায় থাকবে। মতনৈক্য, মতপার্থক্য চিন্তার বিভাজন ও গ্রুপিং থাকবেনা।

৮. নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে আন্তরিকও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রতিপক্ষ ও প্রতিহিংসা মূলক মনোভাব থাকবেনা।

৯. নেতৃত্ব হবে নৈতিক মানসম্পন্ন।

আদর্শ ট্রেড ইউনিয়নগঠন কেন?

১. ট্রেড ইউনিয়নের ইসলামীকরণ। সমাজতন্ত্রের দর্শন Trade union is tha school of communism আমাদের দর্শন- Trade union is the school of islam.

২. প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের ধারায় পরিবর্তন সাধন করে নতুন ধারার সূচনা করা।

৩. শ্রম সেক্টরে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

৪. শ্রমিজীবী মানুষকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা/মজলুম মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা। "লা তাজলেমুনা ওলাতুজলামুন" এ শ্লোগান সর্বপর্যায়ে চালুকরা।

৫. শ্রমিক ময়দানে আদর্শিক প্রভাবসৃষ্টি/শ্রমিকদের ইসলামী আদর্শের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা।

৬. সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের নিকট আন্দোলনের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও শোষণ থেকে রক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখা।

৮. শ্রমিকদের নৈতিক উন্নতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।

৯. শ্রমিক ময়দানকে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রস্তুত করা।

আদর্শ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা

১. নেতৃত্বকে গতিশীল ও স্বচালিত হতে হবে।

২. ইউনিয়নের সাংগঠনিক মান নিশ্চিত করা।

৩. শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান ও শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

৪. শ্রমিকদের বিপদে-আপদে পাশে থাকা, নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে রক্ষায় সামনে থেকে ভূমিকা রাখা।

৫. শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, স্মারকলিপি ও মানব বন্ধনের আয়োজন করা।

৬. ব্যাপক শ্রমিকবান্ধব ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. যথার্য ইস্যু সনাক্ত করা এবং শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখা।

৮. শ্রমিক সেবামূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিক মহলে ইউনিয়নের প্রভাব সৃষ্টি করা।

৯. চৌকস শ্রমিক নেতা ও কর্মী গঠনে পরিকল্পিত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা।

১০. ইউনিয়নভূক্ত সদস্য ও জনশক্তির মানউন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. নিয়মিত সাধারণ সদস্য, কর্মী ও সদস্য বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

১২. পারস্পারিক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৩. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো এক্ষেত্রে নিয়মিত আয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা, শুভাকাঙ্খী বৃদ্ধি করা, সদস্য চাঁদা আদায় করা।

১৪. ইউনিয়নের নিয়মিত সাধারণ সভাসহ সাংগঠনিক মৌলিক প্রোগ্রাম ও তারবিয়াতি বৈঠকাদি নিয়মিত বাস্তবায়ন করা।

১৫. প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা।

১৬. ইউনিয়নের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতি বছর রিটার্ণ দাখিলের ব্যবস্থা করা।

১৭. পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়মিত কার্যক্রম চালুকরা (সাইন বোর্ডসহ অফিস) অফিসিয়াল কাগজপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।

১৮. সাধারণ সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এক্ষেত্রে কোরআনের বেসিক জ্ঞান শ্রমিকদেরকে দেওয়া, অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত শিখাতে উদ্যোগ নেওয়া, সর্বপর্যায়ে কোরআনের চর্চা বাড়ানো, নিজে কোরআন শিখে অন্যকে শিখানো।

১৯. বিকল্প যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০. ভারসাম্যপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাওয়া।

২১. চিন্তার ঐক্য ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন।

২২. বছরের শুরুতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং প্রতিমাসে ইউনিয়নের কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরি ও উর্ধ্বতনে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

২৩. সমমনা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের তালিকা করে নিয়মিত যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২৪. ইউনিয়ন সমূহের নেতৃত্বে প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা।

২৫. ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল নেতৃবৃন্দ ও জনশক্তির পারস্পরিক মোয়ামেলাত ও ভ্রাতৃত্ববোধ ঠিক রাখা।

২৬. শ্রম আইন জানা, ট্রেড ইউনিয়ন আইন জানা, শ্রম মন্ত্রনালয়, শ্রম অধিদপ্তর ও তার সংশ্লিষ্ট অফিস ও কর্মকর্তা সম্পর্কে ধারনা রাখা ও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

২৭. ইউনিয়ন সমূহকে আন্দোলনের সত্যিকার মেজাজ ও পরিবেশের আলোকে গড়ে তোলা।

২৮. বিভিন্ন দিবস (স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শ্রমিক দিবস) পালনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াতী প্রভাব বলয় বৃদ্ধির চেস্টা করা।

২৯. সর্ব পর্যায়ের জনশক্তিকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের আন্দোনে সাধারণ শ্রমিকদেরকে সম্পৃক্ত করার কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

আই.কিউ, প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি

ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি

আই.কিউ (I.Q) হল ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট (Intelligence Quotient)। বাংলায় বলা হয় "বুদ্ধির ভাগফল"। যার বুদ্ধি বেশি তার বুদ্ধির ভালফলও বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা কোন ধরণের বুদ্ধির ভাগফল। অর্থাৎ আই.কিউ বলতে আমরা কোন প্রকৃতির বুদ্ধির ভাগফলকে বুঝি? সাধারণত বুদ্ধি হল "ব্যক্তির জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের প্রয়োগ এবং বিমূর্ত চিন্তার যোগ্যতা।" মানুষ বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আর বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে। মূলতঃ বুদ্ধি হল সহজাত, আর জ্ঞান হল অর্জিত। সে জন্য বুদ্ধিকে জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার বলা হয়। মানুষের প্রজ্ঞার প্রাথমিক ভিত্তি হল বুদ্ধি আর দ্বিতীয় ভিত্তি হল জ্ঞান। আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল বলতে মূলতঃ আমরা মানুষের মানসিক বয়স দ্বারা অর্জিত বুদ্ধির ভাগফলকে বুঝি। যে বুদ্ধির মূল উৎস হল মানুষের কল্পনা শক্তি বা দূরদর্শী চিন্তা। সে জন্য বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, "Imagination is more important than knowledge" অর্থাৎ "জ্ঞানের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কল্পনা শক্তি বা দূরদর্শী চিন্তা।" এবার আসা যাক আই.কিউ সম্পর্কিত মূল কথায়। মূলতঃ আই.কিউ পদ্ধতির জনক হলেন ফরাসীর বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী "আলফ্রেড বিনেট"। ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরা খারাপ ফলাফল করলে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি এবং শিক্ষকবৃন্দ এই বিষয়ে পরামর্শের জন্য মনোবিজ্ঞানী "আলফ্রেড বিনেট" এর দারস্থ হন। তিনি দীর্ঘ এক বছরের অধিক সময় গবেষণা করে ১৯০৫ সালের শেষের দিকে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি যাচাইয়ের জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইতিহাসে যার নাম Intelligence Quotient বা সংক্ষেপে I.Q। উক্ত পদ্ধতিতে তিনি যে বিষয়ে আলোকপাত করেন তা হল, তার মতে প্রত্যেকটি মানুষের দুই ধরণের বয়স রয়েছে। একটি হলো, Chronological Age (ক্রোনোলজিক্যাল এইজ) বা প্রকৃত বয়স, দ্বিতীয়টি হলো Mental Age (মেন্টাল এইজ) বা মানসিক বয়স। তিনি বলেন, "মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দ্বারা ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ করলে যে

ফলাফল পাওয়া যাবে তাই হলো ঐ ব্যক্তির আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল।" এখন প্রশ্ন হলো প্রত্যেকে তার প্রকৃত বয়স বা জন্মগত বয়স জানে। কিন্তু মানসিক বয়স কিভাবে নির্ণয় করা যাবে? এ ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতির সূচনা করেন তা হল, তিনি ৫ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ১৬ শ্রেণি শিক্ষার্থীর জন্য ১৬ ধরণের প্রশ্ন তৈরি করেন। এরপর ১০ বছরের দুই জন শিক্ষার্থীকে তিনি প্রথমে ১০ বছরের শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা দুটি প্রশ্ন দেন। একজন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে অন্যজন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনা। যে শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাকে উপরের দিকের শিক্ষার্থীর জন্য তৈরী করা প্রশ্ন দিতে থাকলে দেখা যায় যে ঐ শিক্ষার্থী ক্রমাগতভাবে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তৈরী করা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এক্ষেত্রে আলফ্রেড বিনেট ঐ শিক্ষার্থীর মেন্টাল এইজ বা মানসিক বয়স নির্ধারণ করে ২০ বছর। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি তাকে ক্রমাগতভাবে নিচের বয়সের প্রশ্ন দিতে থাকলে দেখা যায় যে, ঐ শিক্ষার্থী কেবল ৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরী করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আলফ্রেড বিনেট ঐ শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স নির্ধারণ করেন ৫ বছর। এখন ১০ বছর বয়সের যে শিক্ষার্থী ২০ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো তার আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল হবে ২০ ১০=২, ২ ১০০=২০০। অপরদিকে ১০ বছর বয়সের যে শিক্ষার্থী কেবল ৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো তার আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল হবে ৫ ১০=০.৫০, ০.৫০ ১০০=৫০। তাহলে আমরা দেখলাম একই বয়সের এবং একই ক্লাসের দুইজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনের আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল হল ২০০, আর অন্যজনের আই.কিউ হল ৫০। আই.কিউর এই পার্থক্য মূলত প্রকৃত বয়সের জন্য নয় বরং মানসিক বয়সের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ যে ১০ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে ২০ বছরের মানুষের ন্যায় চিন্তা করতে পারে, বুঝত পারে, ভাবতে পারে, যে ২০ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে ৪০/৫০ বছর বয়স্ক মানুষের ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী চিন্তা করতে পারে সে তার মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করে, তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে বাড়াতে পারবে। ফলে তার আই.কিউ বা বুদ্ধির ভাগফল বেড়ে যাবে। সে জন্য একজন মানুষের আই.কিউ নির্ভর করে তার প্রতিভার উপর। আমরা জানি, "পৃথিবীর সকল মহামানবেরাই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অসীম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের প্রতিভা দ্বারা শুধু দেশ জাতির জন্য অবদানই রাখেননি বরং পরবর্তী প্রজন্মের উপর তাদের প্রতিভার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন শত শত বছর ধরে। সে জন্য মহামানবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাইকেল এইচ. হার্ট বলেছেন, "তিনি তত বড় মহামানব যিনি তার প্রতিভা দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের উপর যত বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন।" আর প্রত্যেক মহামানবেরই মানসিক বয়স ছিল প্রকৃত বয়স থেকে অনেক বেশি। সে জন্য তারা তাদের সময়ে দাড়িয়ে ২/৩ শত বছর পরে কি হবে তা বলতে পারতেন"। তাহলে আই.কিউ কম বেশি নির্ভর করে প্রতিভার উপর। অর্থাৎ যার প্রতিভা বেশি তার আই.কিউ বেশি। আর যার প্রতিভা দূর্বল তার আই.কিউও কম হবে-এটাই স্বাভাবিক।

প্রতিভা: প্রতিভা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Genius (জিনিয়াস)। আর যিনি প্রতিভাধর ব্যক্তি তাকে বলা হয় Geniuses। মূলতঃ প্রতিভা হল সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দ্রুততার সাথে কর্তব্য সমাধান করার এমন এক মানবিক যোগ্যতা যা ব্যক্তি তার নিজের অজান্তেই সম্পন্ন করে। প্রতিভা কোনো জন্মগত বিষয় নয়, প্রতিভা হচ্ছে তৈরির বিষয়।

"পৃথিবীর সকল মহামানবেরাই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অসীম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের প্রতিভা দ্বারা শুধু দেশ জাতির জন্য অবদানই রাখেননি বরং পরবর্তী প্রজন্মের উপর তাদের প্রতিভার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন শত শত বছর ধরে। সে জন্য মহামানবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাইকেল এইচ. হার্ট বলেছেন, "তিনি তত বড় মহামানব যিনি তার প্রতিভা দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের উপর যত বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন।" আর প্রত্যেক মহামানবেরই মানসিক বয়স ছিল প্রকৃত বয়স থেকে অনেক বেশি। সে জন্য তারা তাদের সময়ে দাড়িয়ে ২/৩ শত বছর পরে কি হবে তা বলতে পারতেন"

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Genius may be made rather than born" অর্থাৎ প্রতিভা জন্মায় না বরং তৈরি হয় । এই কথার সাথে সকল মনোবিজ্ঞানী একমত নয় । কারো মত এর উল্টোও রয়েছে । যেমন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড্রাইডেন এর মতে "প্রতিভা তৈরি সম্ভব নয়-এটি জন্ম নেয়" । তবে তার মতে প্রতিভা জন্ম নিলেও প্রতিভার যত্ন না নিলে তার অকাল মৃত্যু ঘটবে । তিনি আরও বলেন, "অনুকূল পরিবেশ না পেলে যেভাবে জন্ম নেওয়া উদ্ভিদও বেঁচে থাকেনা, তেমনি প্রতিভার চর্চা না হলে তা জন্ম নিয়েও লাভ হয়না" । তাহলে মূল কথা কি দাঁড়ালো? প্রতিভা তৈরি হউক বা জন্ম হউক-যাই হউক না কেন প্রতিভাকে লালন করতে হবে । বিজ্ঞানী এডিসন বলেছেন "প্রতিভা হল "একভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ কঠোর পরিশ্রম" । বিখ্যাত মনীষী ভলটেয়ার এর মতে "প্রতিভা বলে কোনো জিনিস নেই । কঠোর পরিশ্রম কর, সাধনা কর, প্রতিনিয়ত জ্ঞান চর্চা কর, অবশ্যই প্রতিভাকে জয় করতে পারবে ।" প্রতিভা সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটন বলেন "প্রতিভা বলতে কিছুই নেই-কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার ও কঠোর অধ্যবসায় প্রতিভার জন্ম দেয় ।" মূলতঃ প্রতিভা হল "সাধারণ জিনিসকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা" । অর্থাৎ যারা জটিল জিনিসকে সরলভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন তারাই প্রতিভাবান । সে জন্য বলা হয়, "বিজয়ীরা ভিন্ন কিছু করেনা, তারা একই কাজ ভিন্ন ভাবে করে থাকে" । সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড শেংক এর মত "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বা প্রতিভা কোনো জীবাশ্ম জ্বালানী নয় যে তা একটা সময় ফুরিয়ে যাবে । কার্যত প্রতিভা হল বায়ু শক্তির তো । প্রতিভাকে ইচ্ছে মত কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত হওয়া যায় । জিনিয়াস বা প্রতিভাবান হওয়ার জিন সকলের মধ্যে রয়েছে । প্রয়োজন পরিবেশ, অধ্যবসায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টার । আমরা মূলতঃ মানসিকতার অভাবে আমাদের ভেতরটাকে আলোকিত করতে পারছিনা এবং আমাদের ভেতরের আলোকে বাহিরে এনে অন্যের উপকারে লাগছিনা ।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে "যেকোনো কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে করার যোগ্যতাই হল প্রতিভা ।" এ সূত্রে সকল মানুষই জন্মগতভাবে প্রতিভাবান । কেননা মহান স্রষ্টা সকল মানুষকেই প্রতিটি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন । কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের উদাসিনতা এবং গাফিলতি ও আলস্য আমাদেরকে অকর্মন্য করে ফেলে । এক সময় আমরা ধরে নিই, আমি অযোগ্য, অথর্ব এবং আমার মাঝে কোনো প্রতিভা বা যোগ্যতা নেই । সেজন্য বলাহয় প্রতিভা প্রকাশ হওয়া আর বিকশিত হওয়া এক জিনিস নয় । মূলতঃ প্রতিভা বিকশিত হওয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে । আর নিয়মিত চর্চা, সাধনা এবং অধ্যবসায় ব্যতিত প্রতিভা বিকশিত হওয়া মোটেও সম্ভব নয় । মোট কথা হল প্রতিভা মানব প্রকৃতির এমন এক শক্তি বা গুণ যার মাধ্যমে মানুষ বিস্ময়করভাবে সমাজের জন্য অবদান রেখে নিজেকে শুধু সমকালীন সময়ের জন্য গৌরবান্বিত করতে সক্ষম হয়না বরং যুগ যুগ ধরে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে (অমর হয়ে থাকতে) সক্ষম হয় । তাই প্রতিভা মূলতঃ সাধনা ও প্রচেষ্টার বিস্ময়, "কেউ জন্মগতভাবে তা লাভ করলেও সাধনার মাধ্যমে তাকে লালন করতে হবে, আবার কেউ জন্মগতভাবে প্রতিভাহীন হলেও নিয়মিত জ্ঞানচর্চা, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিভাবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে । বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিভা তৈরির মূল বিষয় হচ্ছে ব্রেন বা মস্তিষ্ক । প্রতিভা বৃদ্ধির উপায় হচ্ছে মস্তিষ্ক কোষগুলোকে কাজে লাগানো । যে তার মস্তিষ্ক কোষকে যত বেশি কাজে লাগাবে সে তত বেশি প্রতিভাবান হবে । মস্তিষ্কের কোষকে যথাযথ কাজে লাগাতে হলে মস্তিষ্কের পুষ্টির যোগান অপরিহার্য" । মস্তিষ্কের পুষ্টি হল বিশুদ্ধ রক্ত, অক্সিজেন ও গ্লুকোজ । আমরা জানি যে, চারটি মহাধমনীর মাধ্যমে হার্ট মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছায়, আর রক্ত, অক্সিজেন ও গ্লুকোজকে বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায় । মস্তিষ্কের ওজন গোটা শরীরের ওজনের শতকরা দুইভাগ হলেও মস্তিষ্কে রক্তের চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগ এবং অক্সিজেন এর চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ । মানুষের যা এনার্জির দরকার তার শতকরা ২০ ভাগ এনার্জি মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় । পূর্বেই বলা হয়েছে মানুষ তার মস্তিষ্কের কোষকে যত বেশি কাজে ব্যবহার করতে পারবে তত বেশি প্রতিভাবান হবে । কেননা মস্তিষ্কের কোষই হচ্ছে মানুষের তথ্য ভান্ডার । আর মস্তিষ্ক কোষকে কাজে লাগানোর অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে "নিরবে সৃজনশীল চিন্তা করা" । মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রতিভা তৈরির ক্ষেত্রে তিনটি জিনিসের ভূমিকা মূখ্য । প্রথমত: মনোযোগ (মনোযোগ হচ্ছে "চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার জটিল সমন্বয়"), দ্বিতীয়ত: উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতা, তৃতীয়ত: প্রেরণা ।

"

"কেউ জন্মগতভাবে তা লাভ করলেও সাধনার মাধ্যমে তাকে লালন করতে হবে, আবার কেউ জন্মগতভাবে প্রতিভাহীন হলেও নিয়মিত জ্ঞানচর্চা, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিভাবান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে । বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিভা তৈরির মূল বিষয় হচ্ছে ব্রেন বা মস্তিষ্ক । প্রতিভা বৃদ্ধির উপায় হচ্ছে মস্তিষ্ক কোষগুলোকে কাজে লাগানো । যে তার মস্তিষ্ক কোষকে যত বেশি কাজে লাগাবে সে তত বেশি প্রতিভাবান হবে । মস্তিষ্কের কোষকে যথাযথ কাজে লাগাতে হলে মস্তিষ্কের পুষ্টির যোগান অপরিহার্য" ।

"

সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে একজন শিক্ষার্থীর প্রতিভা তৈরি বা বিকাশের ক্ষেত্রে ২০ টি উল্লেখযোগ্য অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তা হলো: (১) দূষিত বায়ু বা আবহাওয়ায় বসবাস করা (২) অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকান্ড বেশি হয় এমন পরিবেশে বাস করা (৩) সৃজনশীল চিন্তা না করা (৪) গবেষণাধর্মী অধ্যয়ন না করা (৫) অশ্লীল/যৌন চিন্তা বেশি করা (৬) সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা (৭) মানুষের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলা (৮) কম কথা বলা বা বেশি কথা বলা (৯) কম বা বেশি ঘুমানো (১০) ঘুমানোর সময় মাথা ঢেকে শোয়া (১১) অসুস্থ্য অবস্থায় বেশি কাজ করা (১২) সকালের নাস্তা না খাওয়া (১৩) বেশি খাওয়া (১৪) অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা এবং দিনে অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠা (১৫) মস্তিষ্ককে কর্মহীন রাখা (১৬) ধুমপান/মাদক সেবন বা কোমল পানীয় গ্রহণ করা (১৭) অতিরিক্ত তৈলাক্ত জিনিস বা তেলে ভাজা জিনিস বেশি খাওয়া (১৮) সংকীর্ণ মানসিকতা পোষণ করা (১৯) শরীরে অতিরিক্ত ব্লাড সুগার থাকা বা কম ব্লাড সুগার থাকা (২০) বুদ্ধিমান ও সৎচরিত্রের মানুষকে বাদ দিয়ে বোকা ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রতিভা তৈরির উল্লেখিত অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করতে পারলে এবং নিয়মিত জ্ঞানচর্চা, অধ্যবসায় এবং নিরব সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তিই নিজের প্রতিভাকে ক্রমাগতভাবে বিকশিত করতে পারবে। আর একজন মানুষ যত বেশি প্রতিভাবান হবেন, তার আই.কিউ তত বেশি বৃদ্ধি হবে।

স্মৃতি শক্তি: স্মৃতি হল দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সহযোগীতায় তৈরি একটি প্রক্রিয়া, যা আমাদের অতীত ঘটনা মনের ভেতর ধরে রেখে দেয় ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কতগুলো নিজস্ব ধারণা সৃষ্টি করে। সহজ কথায় স্মৃতি বলতে মূলত: তথ্য ধারণ করে পুনরায় তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। মানবদেহের বহু প্রক্রিয়ার সমন্বিত প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে মানুষের স্মৃতি জ্ঞান বা উপলব্ধি। R.N.A (Rebonucleic Acid) নামে এক ধরণের এসিড হল স্মৃতির প্রধান উৎস। মস্তিষ্কের কিছু অংশ স্মৃতির কম্পিউটার হিসেবে কাজ করে। মস্তিষ্কের যে অংশ স্মৃতিকে ধরে রাখার কাজ করে তা ঠিকমত কাজ না করলে আমরা স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারিনা। অনেক সময় মারাত্মক অসুখ বা দূর্ঘটনায় মস্তিষ্কের ঐ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা পূর্বের স্মৃতি একদম ভুলে যাই। স্মৃতি শক্তির তিনটি স্তর। প্রথমত: শেখা অর্থাৎ নতুন কিছু তথ্য বা তত্ত্ব শেখার মাধ্যমে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বা জানার মাধ্যমে বা অনুশীলনের মাধ্যমে অবগত হওয়া। দ্বিতীয়ত: সেই শিক্ষা বা তথ্য বা তত্ত্বকে মস্তিষ্কে ধারণ করা। তৃতীয়ত: প্রয়োজনমতো সঞ্চিত জ্ঞান স্মরণে নিয়ে আসা, সহজ কথায় Learning বা শেখা, Storing বা গুদামজাত করা, Recalling বা Retentions বা পুনরায় স্মরণের মাধ্যমে সঞ্চিত জ্ঞানকে কাজে লাগানো। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের স্মৃতি শক্তির প্রখরতা নির্ভর করে Recall এর উপর। অর্থাৎ Recall এর মাধ্যমে মানুষ মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চিত তথ্য কি পরিমাণ পায় তার উপর নির্ভর করে তার স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর। এই Recall আবার দুই ধরণের। প্রথমত: Serial বা ক্রমানুসারে, দ্বিতীয়ত: Free বা যথেচ্ছ। যেমন কাউকে প্রশ্ন করা হল খ এর পর কোন বর্ণ? সে A, B, C, D, E, F ইত্যাদি ক্রমানুসারে বলে তারপর বললো খ এর পর গ বর্ণ। তাহলে এক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণ তার স্মৃতিশক্তিতে Serial বা ক্রমানুসারে সাজানো রয়েছে। অপরদিকে আরেক জনকে জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে সে বলে দিল খ এর পর গ বর্ণ। তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্মৃতিশক্তিতে ইংরেজি বর্ণ Free বা যথেচ্ছভাবে সাজানো আছে। অনুরূপ কাউকে ১২ এর নামতার ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হল আট (৮ ১২) বার কত? সে যদি শুরু থেকে বলতে বলতে যায় তবে এ ক্ষেত্রে তার স্মৃতিশক্তি হবে Serial, আর যদি সরাসরি বলতে পারে, তবে তার স্মৃতিশক্তি হবে Free। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্মৃতি শক্তির Recall এর সময় Serial এবং Free নির্ভর করে কিসের উপর? মূলতঃ তা নির্ভর করে Learning এবং Storing এর সময়, Attention বা মনোযোগের উপর। অর্থাৎ শেখা ও গুদামজাত করার সময় যার বেশি মনোযোগ থাকবে তার স্মৃতিশক্তি তত বেশি Free হবে। এখন সবচাইতে জটিল জিনিস হচ্ছে Attention বা মনোযোগ। কেননা মনোযোগ হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার জটিল সমন্বয়। সে জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, "মানুষ যা ভুলতে চায় তাই ভুলে যায়, যা মনে রাখতে চায় তাই মনে রাখে।" মূলতঃ মানুষ যদি কোনো কিছু শেখা বা জানার সময় পূর্ণ মাত্রায় মনোযোগ দেয়, তবে সে তা অবশ্যই মনে রাখতে পারবে। আর যদি উদাসিন থাকে তবে সে তা ভুলে যাবে। যাদের স্মৃতি শক্তি প্রখর তাদের আমরা মেধাবী বলে থাকি। মূলতঃ একজন মেধাবী মানুষের প্রথমতঃ স্মৃতিশক্তি, দ্বিতীয়তঃ স্মরণশক্তি, তৃতীয়তঃ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চতুর্থতঃ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, পঞ্চমতঃ সাধারণ গড়ের চাইতে বেশি বুদ্ধিমত্তা এবং স্থান, কাল পাত্র ভেদে যখন যেখানে যা প্রয়োগের প্রয়োজন মেধাবীরা তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে বলেই তারা ব্যতিক্রম। তবে মধাবীদের এই অর্জন কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এর মাধ্যমে হয়-অলৌকিকভাবে নয়। যেমন সক্রেটিস এর সময় এথেন্স শহরে দশ হাজার লোক বাস করতো-সক্রেটিস এই দশ হাজার লোকের প্রত্যককে নামে চিনতেন। অথচ আমরা ৪০/৫০ জন মানুষের নামও মনে রাখতে পারিনা। আর নাম মনে রাখার সহজ উপায় হল যখন কেউ নাম বলবে, ঐ নামের সাথে আপনার পরিচিত অত্যন্ত কাছের যার নাম মিলবে-তার সাথে মিলিয়ে মনোযোগ দিয়ে ১০/১৫ বার মনে মনে ঝপলেই ঐ নাম অবশ্যই মনে থাকবে। অর্থাৎ আপনি ঐ মানুষটার প্রতি কতটা মনোযোগ দিলেন, তাকে কতটা স্মরণ রাখতে চান এবং সে আপনার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার উপর নির্ভর করে-আপনি তাকে মূল্যায়ন করলে--আপনি শুধু তার নাম কেন সবকিছুকেই মনে রাখতে পারবেন। মূলত: স্মৃতিশক্তি আর প্রতিভা ওতোপ্রতভাবে জড়িত। প্রতিভাবান দের স্মৃতিশক্তি প্রখর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধারণত ১০/১২ বছর বয়স হতে মানুষের স্মৃতিশক্তির কার্যকারিতা শুরু হলেও এর পূর্ণতা পায় ২৫/২৬ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর থেকে স্মৃতিশক্তি আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং ৫৮/৫৯ বছরে এসে তা অনেকটা লোপ পায়। যার কারণে আমরা অনেক বয়স্ক মানুষকে দেখি যাদের অনেক কিছু মনে থাকেনা। বিশেষ করে ৬০ বছর পার হওয়া প্রবীণরা কোনো কিছু খেলে বলে খাই নাই, বললে বলে বলি নাই, আবার কোনো কিছু কোথাও রাখলে মনে থাকেনা ইত্যাদি। এর কারণ তাদের স্মৃতিশক্তির পূর্বের ন্যায় কার্যকারিতা নেই। এখন প্রশ্ন হলো আমরা যখন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দেখি, যাদের বয়স ৭০/৮০ বছর হলেও তারা অকপটে সব মনে রাখতে পারে-বলতে পারে এবং সব কাজ করতে পারে, এটা কিভাবে সম্ভব? যার কারণে তারা অবসরে গিয়েও বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীতে মোটা অংকের বেতনে চাকুরী করে। এর মূল কারণ হল প্রাথমিক জীবনে তারা অত্যন্ত প্রতিভাবান হওয়ার কারণে ৫৮/৫৯ বছর বয়সে তাদের প্রাথমিক স্মৃতিশক্তি লোপ পেলেও ৬০ বছর পর তাদের নতুন করে সেকেন্ডারী মেমোরী তৈরী হয়েছে-যা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকবে। মূলতঃ কেবলমাত্র প্রতিভাবানদের সেকেন্ডারী মেমোরী তৈরি হয়, মূর্খদের নয়। তাই ৬০ বছর বয়সের পর যতদিন বাঁচবেন-ততদিন সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে সেকেন্ডারী মেমোরীর কোনো বিকল্প নেই। যার একমাত্র

> "ইসলামী শরিয়তের আলোকে যেকোনো জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের কল্যান। কেউ এই সহীহ নিয়তে জ্ঞান অর্জন করলে সে জ্ঞান তার স্মৃতিতে অবশ্যই থাকবে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি তার যিকির করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা কাহ্‌ফে উল্লেখ করেন। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন, বলনু, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথ নির্দেশ করবেন"। (সূরা-কাহ্‌ফ: ২৪, আংশিক)

উপায় হল প্রতিভাবান হওয়া। সেই প্রতিভা জন্মসূত্রে হউক বা তৈরি করে নিতে হউক, যেকোনো ভাবেই হউক না কেন আপনাকে প্রতিভাবান হতেই হবে।

ইসলামী শরিয়তের আলোকে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়: "ইসলামী শরিয়তের আলোকে যেকোনো জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের কল্যাণ। কেউ এই সহীহ নিয়তে জ্ঞান অর্জন করলে সে জ্ঞান তার স্মৃতিতে অবশ্যই থাকবে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি তার যিকির করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা কাহ্‌ফ উল্লেখ করেন। "যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন, বলনু, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতও নিকটতম সত্যের পথ নির্দেশ করবেন"। (সূরা-কাহ্‌ফ:২৪ আংশিক)

আমাদের যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্মৃতিশক্তি কে প্রখর করতে পারি সে জন্য পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বা-হা এর ১১৪ নং আয়াতে (আংশিক) মহান আল্লাহ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন এভাবে-"বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন"। ইসলামী শরিয়তের আলোকে পাপ কাজ মানুষের স্মৃতিশক্তিকে দূর্বল করে দেয়। ইসলামের আলোকে জ্ঞান নূর বা আলো আর পাপ হচ্ছে অন্ধকার। তাই আলো এবং অন্ধকার যেমন একসাথে থাকতে পারেনা-তেমনি পাপী কখনো জ্ঞানী তথা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে পারেনা। একবার এক ব্যক্তি মালিক ইবনে আনাসকে প্রশ্ন করলেন "হে আল্লাহর বান্দা, আমার স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে দিতে পারে এমন কিছু আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, যদি তুমি স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করতে চাও, তবে পাপ কাজ ছেড়ে দাও।" মূলতঃ মানুষ যখন অব্যাহতভাবে পাপ কাজ করতে থাকে, তখন তার নিজের ভেতর ক্রমাগত একটা অপরাধবোধ কাজ করতে থাকে। ফলে তার সৃজনশীল অনুভূতি ক্রমাগত অকার্যকর হয়ে যায়-যার ফলে প্রতিনিয়ত তার স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে। ইসলামী স্কলারদের মতে নিয়মিত কিছু অনুশীলন মানুষের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে। যেমন: প্রথমত: যে কোনো বিষয় বার বার পড়া। একটা বিষয় যত বেশি পড়া হবে তত বেশি তা স্মৃতিতে গাঁথা হবে। বিশেষ করে কোনো কিছু সূর দিয়ে বা ছন্দ মিলিয়ে পড়লে তা স্মৃতিতে অনেকদিন থেকে যায়। দ্বিতীয়ত: অন্যকে শেখানো। কাউকে অর্থ দিলে অর্থ কমে কিন্তু জ্ঞান দিলে জ্ঞান বাড়ে। তাই অন্যকে যতবেশি শেখানো হবে-নিজের শেখাটা তত বেশি স্মৃতিতে থাকবে। তৃতীয়ত: মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাবার খাওয়া। যেমন সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যয়তুনের তেল স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া যেসকল খাদ্যে অধিক পরিমাণ OMEGA-3 ফ্যাট রয়েছে সে সকল খাদ্য স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপকারী। এছাড়া নিয়মিত মধু পান করলে ও কিসমিস খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। চতুর্থত: খাওয়া এবং ঘুমের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরী। মূলত: একজন মানুষের কাজ, বিশ্রাম, ক্ষুধা এবং আহারের মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্যতা থাকতে হবে। এর কোনোটার ব্যত্যয় ঘটলে স্মৃতিশক্তি লোপ পাবে। পঞ্চমত: কোনো কিছু জানার ক্ষেত্রে হাল না ছাড়া অর্থাৎ একবার না পারিলে দেখ শতবার। যেকোনো বিষয়ে জানার জন্য বার বার চেষ্টা করলে তা যত কঠিন হউক না কেন এক সময় সহজ হয়ে স্মৃতিতে অবশ্যই গেঁথে যাবে। সেজন্য যেকোনো বিষয়ের পিছনে লেগে থাকতে হবে।

পরিশেষে প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধির জন্য দোয়া করবো এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সচেষ্ট থাকবো-যার মাধ্যমে আমাদের আই.কিউ বাড়বে এবং শেষ বয়সে আমরা সেকেন্ডারী মেমোরী অর্জনের মাধ্যমে যাতে সম্মানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি, এবং পরকালে মুক্তি পেতে পারি, সে জন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবো, সকলের নিকট এই প্রত্যাশা করি। আমীন।।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

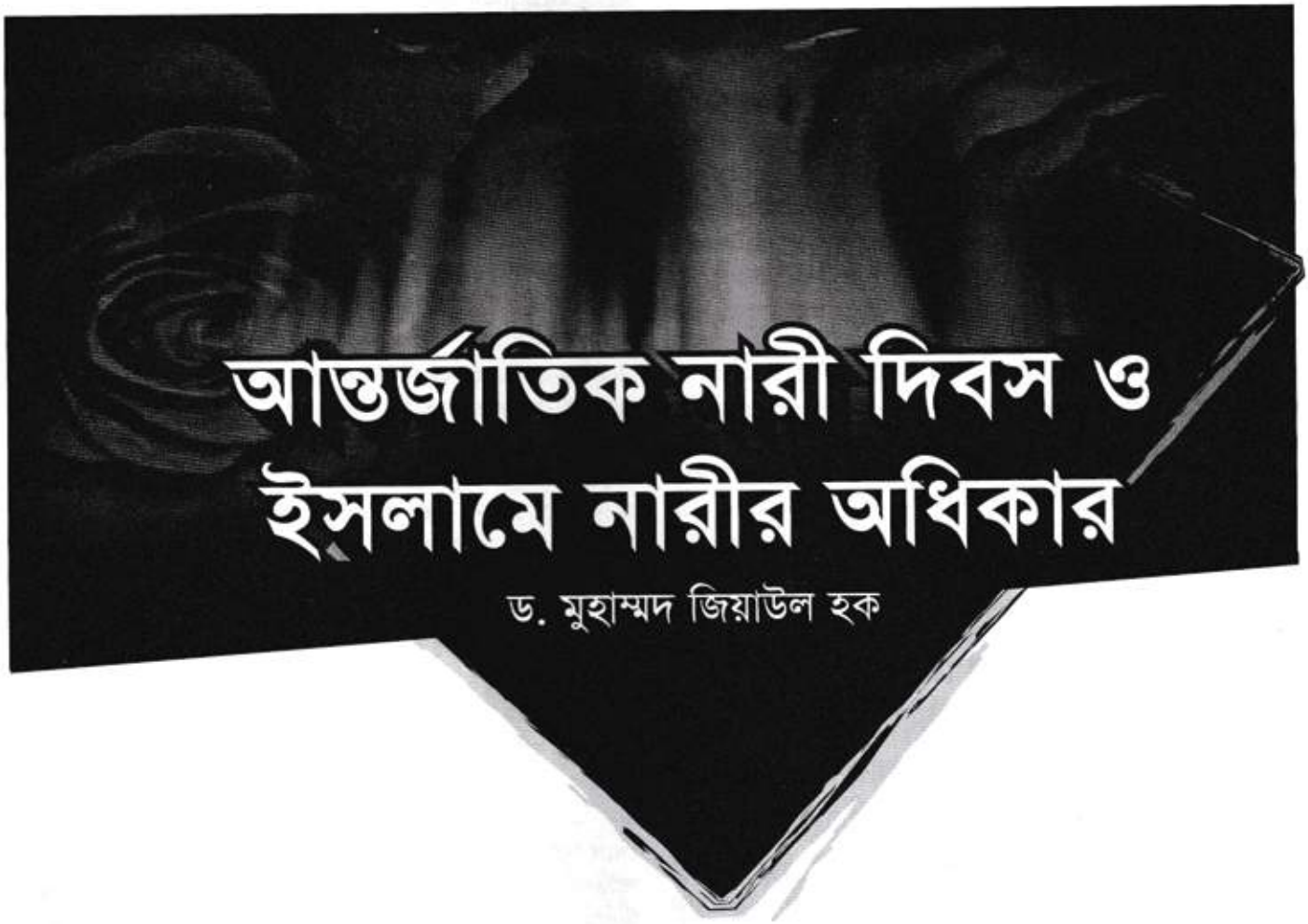

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও ইসলামে নারীর অধিকার

ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক

৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস যা বিশ্ব নারী প্রগতির মাইল ফলক হিসেবে খ্যাত। এ দিবসটির সূত্রপাত হয় ১৮৫৭ সালে আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সূচ কারখানার নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রম ঘন্টা ১৬ থেকে কমিয়ে আট ঘন্টা নির্ধারণ এবং কাজের পরিবেশ উন্নয়নের দাবীতে আন্দোলনের ফসল হিসেবে। ১৮৬০ সালে ঐ সূচ কারখানার নারী শ্রমিকদের নিজস্ব ইউনিয়ন গঠন করার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পায় এ আন্দোলনের। এ দাবীতে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলতে থাকে তাদের। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ ফুসে উঠে এ আন্দোলন, তাদের সাথে যোগদেয় পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকেরা। কর্মঘন্টা কমানো, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন ও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে থাকে আরও শক্তিশালী। সে সাথে যুক্ত হয় ভোটের আধিকার পাওয়ার দাবী। এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে নারী নেত্রী ক্লারা জেৎকিনের প্রস্তাবে এ দিনটিকে 'নারী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৪ সালে ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৫ সালে প্রথমবারের মত ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদযাপন করে। এরপর থেকে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একে রাষ্ট্রীয়ভাবেও পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশেও বিভিন্নভাবে সচেতন নারী সমাজের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। কিন্তু দেখার বিষয় কতটুকু অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে নারী সমাজের। পেপার পত্রিকার পাতা উল্টালেই লিড নিউজে দেখা যায় নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভটিজিং, নারী হত্যা, আত্মহত্যা ও নারী অপহরণের ভয়ংকর খবর। আবার দেখা যায় যৌতুকের লোভে প্রিয় জীবন সঙ্গী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শারীরিক ও মানষিকভাবে নির্যাতনের ভয়ঙ্কর ছবি। এক পর্যায়ে তালাকের মত জঘন্য কাজটিও ঘটে সোনার সংসার আগুনে পরিণত হয়। তাই শুধু দিবস পালন করলেই চলবে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির এবং নৈতিকতার পরিবর্তন করতে হবে। কেননা নারীবাদী আন্দোলনের অনেক কর্মীকেই দেখা যায় তারা শুধু নারীকে নারীই মনে করেন। আর এসমস্ত লোকদের হাতেও নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে দেখা যায়। আর কর্মজীবি নারীদেরকে পরিবার থেকে শুরু করে অফিস পর্যন্ত সহ্য করতে হয় নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির। মহিলারা বাসে উঠতে গেলে বাসের হেলপার বলে সিট নেই, মহিলা উঠা যাবে না। আর ভীড় ঠেলে উঠলে সিটতো পায় না তদুপরি বখাটেদের কাছ থেকে শারিরীক যন্ত্রনার মধ্যে পড়তে হয় তাদেরকে। তাই দেখা যায় যেখানেই নারী সেখানেই তাদেরকে হতে হচ্ছে নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত। আবার আইন ও আন্দোলন হচ্ছে যত বেশি, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা, আধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে তারচেয়েও অনেক বেশি। তাই শুধু আইন ও আন্দোলন করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না; পরিবর্তন করতে হবে মানষিকতার। আর এজন্য আমাদেরকে দ্বারস্থ' হতে হবে ইসলামের। যারা

নিজেদেরকে নারী প্রগতিবাদী বলে দাবি করে তারা মনে করে নারীর উন্নয়ন শুরু হয়েছে ১৮৫৭ সাল থেকে। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সে সময় খোদ নারী তার অধিকারের কথা চিন্তাও করতে পারত না। তারা ছিল শুধু ভোগ্য পণ্য। তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না কোন মানবীক জীবন যাপনের অধিকার। আমরা যারা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত তারা অনেকেরই অজানা রয়েছে নারী অধিকার কি এবং ইসলাম তাদেরকে কি অধিকার দিয়েছে"।

তাই প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার যে নারী অধিকার কি? Oxford Dictionary অনুযায়ী নারী অধিকার বা Womens Rights অর্থ হলো সেই সমস্ত অধিকার যা-নারীকে আইনগত ও সামাজিক অবস্থান আদায় করে দেয় যেগুলো পুরুষ ভোগ করছে এবং তাতে পুরুষের অধিকার রয়েছে।

Modernize Oxford Dictionar অনুযায়ী ইহার অর্থ নতুন করে তৈরি করা, নতুন অবস্থার প্রেক্ষীতে ঢেলে সাজানো বা যুগের চাহিদা মতো গড়ে তোলা। ওয়েবস্টার ডিকশনারী অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায়- নবায়ন করা যা একটি নতুন কাঠামো দেওয়া বা আকার আকৃতি, অবয়ব দেওয়া। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে, পুরুষেরা যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে নারীদেরকেও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়াকে নারী অধিকার বলে"। ইসলাম নারী পুরুষের অধিকারসমূহ সমান্তরালভাবে দিয়েছে। ইহা সমান বটে কিন্তু একই রকম নয়। ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বুঝা যায় যে, ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নির্ধারণ করেছে। ইবাদত-বন্দেগী, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকত, জিকির-আযকার, দান-খয়রাত সকল ক্ষেত্রে সমান ঘোষণা করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে এরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীগণ আল্লাহতে আত্মসমর্পনকারী নিশ্চিত বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা স্থাপনকারী, আন্তরিক ও বিনয়ের সাথে আদেশ পালনকারী সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলা আল্লাহর ভয়ে ভীত ও ভীতা দানকারী ও দানকারিনী রোযা পালনকারী ও কারিনী, লজ্জাস্থান-সমূহের হেফাজত কারী ও হেফাজত কারিনী, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী ও স্মরণকারিনী আল্লাহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ক্ষমা ও সু-মহান পুরস্কার"। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের ইবাদতের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। উভয়ের জন্যই সমান পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অথচ আধুনিক সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমারা বলে থাকে যে জান্নাত শুধু মাত্র পুরুষের জন্য নারীদের কোন স্থান নেই। তারা এই বলে নারী জাতিকে হেয় করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ১২৪ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করবে পুরুষ হোক বা নারী হোক সে যদি ঈমানদার হয় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করা হবে না"। এখানে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের আমলের এবং পুরস্কারের মধ্যে কমবেশী না করে সমান বলেছেন। অনুরূপ ভাবে সূরা আন-নাহলের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, "ভালো কাজ যেই করবে সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক যদি সে ঈমানদার হয় তাহলে তাকে আমি পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবণ যাপন করার এবং পরকালে তাদেরকে উত্তম থেকে উত্তমতম কর্মের ফলাফল অনুযায়ী প্রতিদান বা পুরস্কার প্রদান করব"। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের জন্য জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে জেন্ডার বা লিঙ্গের কোন শর্তারোপ করেন নাই বরং তিনি কর্মের কথা বলে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

"ইসলাম নারীকে যে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদেরকে ইসলাম শুধু পুরুষের সমান অধিকারই দেয় নাই বরং অনেক অনেক বেশী অধিকার দিয়েছে। ইসলাম কন্যা সন্তানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কন্যা সন্তানের অধিকারের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তার জীবনের নিরাপত্তা। জাহিলী যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ নিজের এবং বংশের জন্য লজ্জাজনক বিষয় ছিল। তাই তারা তাদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। আর ইসলাম এক্ষেত্রে ফুলের মত নিস্পাপ কন্যা সন্তানকে আদরের সাথে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে"। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক উভয়ের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আত-তাকবীরের ৮-৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে- "আর যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে তাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল"। এ ছাড়া ধনী ও গরীব সকলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আনআম-১৫১ ও সূরা বনী ইসরাইলের ৩১ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না দারিদ্রতার ভয়ে। কেননা আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি"। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করত। জাহিলিয়াত এখনও নির্মূল হয় নাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে Computer এর মাধ্যমে গর্ভে ভ্রুণ সনাক্ত করে কন্যা সন্তান হলে তাকে পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়। BBC এর রির্পোটার "Emy Bekenen" ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে "Let her Die"বা ওকে মরতে দাও নামের পরিসংখ্যান রির্পোট অনুযায়ী ভারতেই প্রতিবছর প্রায় দশ লাখ কন্যাকে নারী হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়। তামিল নাড়ু ও রাজস্থানের মত রাজ্যগুলোতে বিলবোর্ড এবং পোস্টার ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে পাচঁশ টাকা খরচ করুন ৫ লাখ টাকা সেভ করুন। অর্থাৎ ৫০০ টাকা দিয়ে Computer করে গর্ভের সন্তান কন্যা হলে তাকে হত্যা করে লালন পালনের ব্যয়ভার বাবদ ৫ লক্ষ টাকা বাঁচান। এ হলো ভারতের কন্যা সন্তানের অবস্থা। অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে ভারতের এজেন্ডায় আমাদের দেশে নারী নীতির নামে নারীদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার লক্ষে কুরআন বিরোধী নারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ইহার কিছু প্রভাব দেখা যায়। কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ শুনলে চাঁদের ন্যায় চেহারা মলিন হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ৫৮-৫৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "যখন তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের খবর দেওয়া হয় তখন তাদের চেহারা কালিমা লেপে যায় এবং তখন সে যেন রক্ত বমনের ঢোক গিলতে থাকে। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় এই জন্য যে এ কুৎসিত সংবাদের পর সে মুখ দেখাবে কি করে এবং ভাবতে থাকে এই অপমান সহ্য করে কন্যা সন্তানটিকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে হত্যা করবে"। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় ইসলাম শুধু কন্যা সন্তান হত্যা হারামই করে নাই বরং পুত্র সন্তান হলে আনন্দ অনুষ্ঠান আর কন্যা সন্তান হলে মুখ কালো হওয়াকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরন্তু ইসলাম কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। মুসনাদে আহমদ এ-বর্ণিত হয়েছে। "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির দুটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করবে আর তাকে

ভালোভাবে লালন পালন করবে সে ও আমি জান্নাতে এমনভাবে পাশাপাশি অবস্থান করব" । এ বলে নিজের হাতের দুটি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখান । এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে কন্যা সন্তান হলে তার পিতা, মহানবী (সঃ) এর সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকবে । পুত্র সন্তান হলে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা পুত্র অপেক্ষা সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে" । ইসলাম নারীর অপমান ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে উত্তরণ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে । ইসলাম পূর্ব অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নারীকে শয়তানের গুটি বা হাতের পুতুল মনে করত । অর্থাৎ তারা ধারণা করত শয়তান যত অপকর্ম করে থাকে সব নারীদের মাধ্যমে । আর ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে মহীয়সি হিসেবে । নারী পুরুষের চরিত্রের জন্য ঢাল স্বরূপ । সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে নবী করিম (সঃ) বলেছেন "মুসলমানদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে" । তাহলে তার জন্য নিজের দৃষ্টির সংরক্ষণ এবং চরিত্রের পবিত্রতা বজায় রাখা সহজ হবে । নারীর মর্যাদা দিতে গিয়ে রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন, হাদীসটি হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেনঃ "যে বিবাহ করল সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করলো"এবং অন্য হাদীসে পুরুষের চরিত্র সংরক্ষণ কারী বলা হয়েছে । কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয়নি । পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার-১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে কল্যাণের প্রতীক ঘোষণা করে বলেন, "তোমরা তাদের সাথে সুন্দর জীবন যাপন করো । যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে এমনওতো হতে পারে যে তোমরা তো একটি জিনিস অপছন্দ করছো কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন" । ইসলামে নারীর অবস্থা দাসী বা গৃহপরিচারিকা নয় বরং স্বামী-স্ত্রীর সমপর্যায়ের মর্যাদা দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারা-১৮৭ নং আয়াতে বলেছেন, "তারা তোমাদের জন্য পোষাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক" । পোষাক যেমন মানুষের সতর আবৃত করে এবং সৌন্দর্য বর্ধন করে তেমনি নারী পুরুষ একে অপরের জন্য যাবতীয় দোষ ত্রুটি আবৃতকারী এবং প্রশান্তিদানকারী । ইসলাম নারী ও পুরুষের সামাজিক মর্যাদার মধ্যে কোনই পার্থক্য করে নাই শুধুমাত্র নেতৃত্ব ছাড়া । আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,"নারীদের জন্যও সঙ্গত অধিকার সমূহ রয়েছে যেমন অধিকারসমূহ রয়েছে তাদের উপর পুরুষের" । তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাই স্ত্রী হিসাবে নারীকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ।

ইসলাম নারীকে অতুলনীয় মর্যাদা দিয়েছে মা হিসাবে । যা ইতোপূর্বে কেহ দেয় নাই । আল্লাহ তায়ালার পরেই মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সম্মানজনক আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে । আল্লাহ তায়ালা সূরা-বনী ইসরাইলের ২৩-২৪নং আয়াতে বলেন, "তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে । তোমাদের মাঝে যদি তাদের মধ্য থেকে দুইজন অথবা একজন জীবিত থাকে বার্ধাক্যবসস্থায় তাহলে তাদের সাথে এমন আচরণ করবে না যাতে তারা "উফ" শব্দ উচ্চারণ করে এবং মুখ বাঁকিয়ে বা কর্কশভাবে কথা বলবে না বরং তাদের সাথে কথা বলবে বিনয় নম্র ভদ্রভাবে ও কোমল সূরে এবং তাদের সামনে গর্বের সাথে বা উভয় বাহু বা বুক উচুঁ করে কথা বলবে না । আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এই বলে হে পরম করুনাময় তুমি তাঁদের প্রতি দয়া কর সেভাবে ঠিক যেভাবে তারা শিশুকালে আমাদের প্রতি দয়া মায়া স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেছিলেন" ।

ইসলাম মানুষকে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে মাতা পিতার সাথে মন্দ আচরণ তো করা যাবেইনা উপরন্তু তারা মনে কষ্ট পাবে এমন বৈধ কাজও করা যাবে না । তাদের সামনে কথা বলতে হলে বিনয়ের সাথে সম্মানের সাথে এবং মমতামাখা কণ্ঠে কথা বলতে হবে । অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাতা পিতার সম্মান ও মর্যাদার কথা বলেছেন । কিন্তু অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে পিতার ৩ গুণ মাতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা লোকমান এর ১৪ নং আয়াতে বলেছেন, "আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি পিতা মাতার অধিকার গুলো আদায় করতে । তবে তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে পেটে ধারণ করেছে । আরো দুই বছর তার দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে । আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো" । অনুরূপ ভাবে আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে, "সে তার পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে, তার মা অনেক কষ্ট সহ্য করে তাকে পেটে ধারণ করেছিল । আর অনেক ব্যথাসহ্য করে তাকে প্রসব করেছিল এবং তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশটি মাস সময় লেগেছে" । (সূরা আহকাফ-১৫) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "জান্নাত রয়েছে মায়ের পদ তলে"এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে পথচলার সময় পায়ের নিচে যা পরবে তাই জান্নাতে পরিণত হয়ে যাবে বরং এর মানে আপনার উপর অর্পিত সকল দায় দায়িত্ব পালন করলে এবং মাতা পিতা সন্তুষ্ট থাকে এমন আচরণ, কথা ও কাজ করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাত দিয়ে দিবেন । সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট জানতে চাইলো আমার উপরে সবচাইতে বেশী অধিকার কার রয়েছে । উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন তোমার মায়ের । সে আবার জিজ্ঞাসা করল তার পরে । উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন তোমার মায়ের । লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করল তার পরে । জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন তোমার মায়ের । অতঃপর যখন চতুর্থবার জিজ্ঞেস করল । তার পর রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন তোমার পিতার এ হাদীসের আলোকে শতকরা ২৫ ভাগ অধিকার দেওয়া হয়েছে পিতাকে আর ৭৫ ভাগ অধিকার দেওয়া হয়েছে মাতাকে । যা এভাবেও বলা যায় যে ৪ ভাগের ৩ ভাগ অধিকার মায়ের আর ১ ভাগ অধিকার পিতার । কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে ৭৫ ভাগ সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে ।

"ইসলাম নারীকে চতুর্থ ধাপে যে মর্যাদা দিয়েছে তা বোন হিসেবে । জাহেলী যুগে কোন নারীকে তার ভাই বোন হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত । আর ইসলাম সে অপমানের পিরামিড ভেঙ্গে চুরমার করে ভাই ও বোন পরস্পরের সহযোগী বলে ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন "মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী এরা পরস্পর সহযোগী বন্ধু বা আউলিয়া" আরবী আউলিয়া শব্দের অর্থ সহযোগী বন্ধু বা অবিভাবক । মুমিন নর-নারীগণ পরস্পর ভাই বোন । যদি তাদের মাঝে অন্য কোন সম্পর্ক না থাকে । ইসলাম নারীকে সামাজিক ভাবে এত অধিক মর্যাদা দিয়েছে যা পুরুষের চেয়ে অনেক অনেক গুন বেশী" ।

ইসলাম নারীদেরকে অর্থনৈতিক দিকে পরিপূর্ণ ভাবে সমতার ভিত্তিতে নয় বরং পুরুষের চেয়ে নারীকে একধাপ এগিয়ে অধিকার দিয়েছে । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সূদকে হারাম করেছি" । উক্ত আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সূদ হারাম হওয়া সমভাবে প্রযোজ্য । একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যে সমস্ত ব্যবসা করতে পারবে । নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে । পুরুষের ন্যায় নারী জমি ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ি গাড়ি সকল কিছু তৈরি করতে পারবে । সে বিবাহিতা হোক অথবা অবিবাহিতা হোক সে তার

সম্পদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোন বিধি নিষেধ ছাড়াই ধন সম্পদের ব্যাপারে সব ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যা একজন পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসের কোন স্থানে নারীর কাজ কর্মের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করে নাই। শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দুটি হলো প্রথমতঃ ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ হিজাব বা পর্দা মেনটেইন করতে হবে। ইসলাম নারীদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী এমন ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত হতে নিষেধ করেছে। যেমন মডেলিং ও অভিনয়। এ ছাড়া শরীয়ত অনুমোদিত সকল ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম নারীকে সম্পদ অর্জনের সুযোগ দিয়েছে এবং মালিকানাও তাকেই দিয়েছে কিন্তু তার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষের উপর। বিবাহের পূর্বে নারীর ব্যয় ভার পিতার উপরে বিয়ের পরে স্বামীর উপরে আর স্বামীর অবর্তমানে ছেলে বা ভাইয়ের উপরে। তদুপরি নারীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য মোহরের ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "নারীদের মহোরানা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে আন্তরিক সন্তুষ্টির সাথে আদায় কর। তবে সে যদি খুশী মনে কোন কিছু অংশ তোমাকে ক্ষমা করে দেয়। তাহলে তুমি তা আনন্দের সাথে ভোগ করো"। (সূরা-আন নিসা-৪) নারী যদি তার অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে টাকার কুমীরও হয় তবুও তার ভরনপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। তাহলে বুঝা যায় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে। যেমন একজন লোক একটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে মারা গেল তার সম্পদ অবশিষ্ট ছিল ১,৫০,০০০/= তাহলে শরীয়াহ মোতাবেক পুত্র পায় ১ লক্ষ আর কন্যা পায় ৫০,০০০/=। ইসলাম পিতা ও স্বামীর অবর্তমানে নারীর ব্যয় ভারের দায়িত্ব দিয়েছে ভাইয়ের উপর। এবার ভাইয়ের অবিভাবক হিসেবে বোনের বিবাহ দিতে ব্যয় হলো ৫০,০০০ টাকা। তাহলে নীট হিসাব দাঁড়ালো ভাইয়ের রইল ৫০,০০০/= আর বোনের অংশ হলো ১ লক্ষ টাকা। তাহলে দেখা যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বোন ভাইয়ের চেয়ে অধিক সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলে যাও। তার ও আগে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাধা রক্ত হতে। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু যা সে জানতো না"। (সূরা আলাক ১-৫) উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষ সবাইকে সমান ভাবে শিক্ষার কথা নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ সে সময়ের যখন নারী শিক্ষার কোন ধারণাও ছিল না। রাসূল (সাঃ) এর সময়কালে উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়শা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বড় পন্ডিত। বহু সাহাবী এবং বিখ্যাত তাবেয়ীগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস, ফিকাহসহ বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করেছে। তিনি ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) যিনি নিজে জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, "যখন আমরা সবাই মিলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম না তখন হযরত আয়শা (রাঃ) নিকট স্বরনাপন্ন হলে তার সঠিক জবাব পেয়ে যেতাম।" তিনি ৭৭ জন সাহাবীর উস্তাদ ছিলেন। তা ছাড়া উম্মুল মুমেনীন হযরত সালমা ও ছিলেন সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ আলেম। ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী বলেন, তিনি ৩২ জন সাহাবীর উস্তাদ ছিলেন। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস উম্মুদ দারদা, হযরত আনাস (রাঃ)- এর মাতা উম্মে ছালিমও অনেক বড় মাপের ইসলামী স্কলার ছিলেন। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো সেই সময়ের যখন নারীকে মানুষ মনে করত ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র আর শিশু কন্যাকে জীবন্ত প্রোথীত করা হতো। অন্ধকার অমানিশার বুক চিরে ইসলামের সোনালী সূর্যোদয় পুরুষের ন্যায় নারীকেও দিয়েছে জ্ঞানের আলোকছটা এতে উদ্ভাসিত হয়েছে মহিয়সী নারীর। এখান থেকে বুঝা যায় ইসলাম নারীকে ঠকায় নাই বরং দিয়েছে সমঅধিকার।

ইসলামী শরিয়তের মতে নারী পুরুষ এক সমান। ইহা নারী ও পুরুষের জান, মাল ও ইজ্জতের অধিকার সমানভাবে দিয়ে থাকে। ফলে আইনের অধিকারও একই রূপ। ইজ্জতের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষ সকলের জন্য ইসলামী আইন সমান। যেমন কোন পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করলে ইসলামের যে বিধান অনুরূপ কোন নারী কোন পুরুষকে হত্যা করলে ও একই বিধান। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- অর্থ: "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ তোমাদের জন্য হত্যাগুলোতে কিসাসের বিধান লেখে দেওয়া হলো। অনুরূপ দাসের বিনিময় দাস, নারীর পরিবর্তে নারী"। (সূরা বাকারা-১৭৮ ইসলামী বিধি বিধানে শারীরিক ক্ষতির শাস্তি পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সম্পূর্ণ সমান। একই সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন অর্থ: "চোর পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যখন চুরি করবে তখন তোমরা হাত কেটে দিবে"। অনুরূপভাবে সূরা নূরের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী যেই হোক তাকে একশটি বেত্রাঘাত কর"। ইসলাম শারিরীক শাস্তির বিধান পুরুষ ও নারীর জন্য সমান করে দিয়েছে। তবে মহিলাদের চরিত্রকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষে ইসলাম যুগান্তকারী বিধান কায়েম করেছে। যা পুরুষের জন্য করা হয় নাই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ দিবে তাদেরকে প্রমাণের জন্য ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি তারা তা না করে তাহলে ৮০টি বেত্রাঘাত করো এবং ভবিষ্যতে তাদের কোন সাক্ষীই গ্রহণ করা হবে না"। (সূরা আন নূর-৪) সাধারণ ক্রাইমের শাস্তির জন্য স্বাক্ষী ২ জন আর বড় কোন অপরাধের শাস্তির জন্য সাক্ষী ৪ জন বাধ্যতামূলক। অনুরূপ নারীদের চরিত্রের ব্যাপারে অপবাদের জন্য ৪জন স্বাক্ষী হাজির করতে বলা হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষ সমান আইনের অধিকারী হলেও এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে।

ইসলাম নারীদেরকে অন্যান্য অধিকারের ন্যায় রাজনৈতিক অধিকারও বিশেষ ভাবে দিয়েছেন। নারী এবং পুরুষের ভোটাধিকার একই। ইহাতে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ এরা সবাই একে অপরের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক। এরা একে অপরকে ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। এলোকেরাই তারা যাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অবশ্যই আসবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী"। (সূরা তাওবা-৭১)

পুরুষ ও নারী শুধু সামাজিক ভাবেই নয় বরং রাজনৈতিক ভাবেও একে অপরের জন্য পরিপুরক সাহায্যকারী। ইসলাম নারী ও পুরুষের ভোটের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই। আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার বছর আগে নারীদেরকে পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তায়ালা

পবিত্র কুরআনে বলেছেন "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের আমানতকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করতে"। ইসলাম নারীকে শুধু ভোটাধিকার দেয় নাই। আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দিয়েছে। একদা হযরত ওমর (রাঃ) বিবাহের মোহর নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলে এক বৃদ্ধ মহিলা পেছন থেকে উঠে এর প্রতিবাদ করেন এবং কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন। "যদি তোমরা একজন স্ত্রীর জায়গায় অন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও তাহলে তোমরা যাকে তালাক দিতে চাইছো তার মোহরের জন্য সম্পদের একটি পর্বত যদি দিয়ে থাক, তাহলে তা থেকে একটি জিনিসও ফেরত লইতে পারবে না"। (সূরা-নিসা-২০) অত:পর সেই বৃদ্ধা বললেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা মোহরের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেন নাই। সেখানে ওমর (রাঃ) কিভাবে মহর নির্ধারণ করে দিবেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন নিশ্চয় ওমর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছিল আর এই নারী তা ঠিক করে দিল। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে উত্তরাধিকার মর্যাদার ক্ষেত্রে নারীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। বর্তমানে নারীদর সমানাধিকারের নামে ইসলাম বিরোধী নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা নারীদের জন্য কল্যাণকর মনে হলেও বাস্তবে ইহা নারীদের জন্য বঞ্চিত হওয়ার মূখ্য কারণ হবে। উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তাতে নারীদের ঠকায় নাই বরং উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে একজন ছেলের অংশ দুইজন মেয়ের সমান। মৃতের সন্তান যদি শুধু মেয়েই হয় দুই বা দুয়ের অধিক। তাহলে কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। যদি কন্যা একজন হয় তাহলে পাবে অর্ধেক। মৃত বক্তির সন্তানাদি থাকলে মৃতের পিতা-মাতা উভয়ের অংশ এক ষষ্ঠাংশ। আর যদি সন্তানাদি না থাকে আর পিতা-মাতাই শুধু ওয়ারিস হয় তাহলে মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এগুলো বন্টন হবে মৃতের ওসিয়ত এবং দেনা পরিশোধের পর। তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের বাবা দাদা এবং নিচের দিকে পুত্র-পৌত্র এর মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা বেশী আপন জন। এই বিধান খোদ আল্লাহর নির্ধারিত। আর আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর মহাবিজ্ঞ বিচারপতি। (সুরা আন নিসা ১১)। "ইসলামে উত্তরাধিকার নীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর অংশ অর্ধেক বটে তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সমান পায় যেমন মৃতের কোন সন্তান না থাকলে মাতা পিতা দুজনেই এক ষষ্ঠাংশ করে পায়। মৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় আর তার কোন সন্তান না থাকে তাহলে স্বামী পাবে অর্ধেক। মাতা এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের দ্বিগুনও পেয়ে থাকে"।

তদুপরি আমি আপনাদের সাথে একমত যে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের দ্বিগুন দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক দেওয়া হয়েছে। তারপরও নারী পুরুষের চেয়ে সমান বা তার চেয়ে বেশি পেতে পারে। যেমন অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি। এবার একটি যুক্তি পেশ করছি। ইসলাম নারীদের যাবতীয় ব্যয়ভার পুরুষের উপর ন্যাস্ত করেছে। নারী যদি তার মোহরের টাকা কাজে লাগিয়ে কোটি টাকার মালিক হয় তবুও তার ব্যয়ভার তার স্বামীকেই বহন করতে হবে। যেমন একজন নারীর মাসিক ব্যয় যদি পাঁচ হাজার টাকা হয় তাহলে এক বছরে ব্যয় হবে ষাট হাজার টাকা। কুড়ি বছর বয়সে বিবাহ করলে আর আশি বছর বয়সে মারা গেলে তার পিছনে স্বামীর খরচ হবে ৩ লক্ষ ষাট হাজার টাকা। আবার ধরুন এ মহিলার পিতা ১ ছেলে এবং ১ মেয়ে রেখে মারা গেল, তার দেড় লক্ষ টাকার সম্পদ আছে। মিরাসী আইন অনুযায়ী ছেলে পেল একলক্ষ এবং মেয়ে পেল ৫০,০০০ টাকা। মহিলার বিয়েতে তার ভাই খরচ করল ৫০,০০০ টাকা। তাহলে ফলাফল দাঁড়ালো ছেলের অবশিষ্ট থাকলো ৫০,০০০ টাকা আর মেয়ের হলো ১ লক্ষ টাকা। তাহলে যোগফল দাঁড়ালো যে পিতা ও ভাইয়ের নিকট থেকে পেল আবার বিয়ের সময় স্বামীর নিকট থেকে পেল এবং তার ব্যয়ভার বহনের খরচও তার স্বামীর উপর ন্যস্ত হল। ইহাতে কি প্রমাণ হয়না যে নারী উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ঠকেনি বরং সুবিধা জনক অবস্থানে রয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি নারী পুরুষের অধিকার সমান তবে সকল ক্ষেত্রে একই রকম নয়। যেমন আর একটি উদাহরণঃ যেমন একটা শ্রেণিতে অনেকগুলো ছাত্র-ছাত্রী আছে; তার মধ্যে ছাত্র জাহিদ ৮০% নম্বর পেয়েছে আবার ছাত্রী জাকিয়া ও ৮০% নম্বর পেয়ে দুজনই প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং প্রতি প্রশ্নের নম্বর ছিল ১০ করে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জাহিদ পেয়েছে ৯ আর জাকিয়া পেয়েছে ৭। তাহলে প্রথম প্রশ্নে জাহিদ জাকিয়ার চেয়ে ২ নম্বর বেশি পেয়েছে। অনুরূপ ভাবে ২য় প্রশ্নে জাকিয়া পেয়েছে ৯ আর জাহিদ পেয়েছে ৭। তাহলে ২য় প্রশ্নে জাহিদ অপেক্ষায় জাকিয়া ২ নম্বর বেশি পেয়েছে। আবার তৃতীয় প্রশ্নে জাহিদ ও জাকিয়া পেয়েছে ৮ নম্বর করে। এভাবে সকল প্রশ্নের নম্বর যোগ করলে ফলাফল দাড়ায় তারা উভয়েই ৮০% নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তবে কোন কোন প্রশ্নে জাহিদ বেশী আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জাকিয়া বেশি নম্বর পেয়েছ। কিন্তু তাদের প্রাপ্ত সকল নম্বর যোগ করলে ফলাফল দাঁড়ায় তারা উভয়েই সমান। ইসলামে নারী ও পুরুষের বিষয়টিও ঠিক এরকম। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ তো কোন কোন ক্ষেত্রে নারী। কিন্তু মোট মিলিয়ে যোগ করলে ফলাফল দাঁড়ায় একেবারে সমান। কিন্তু বাংলাদশ এক শ্রেণির নারী লোভী এবং কিছু নারী রয়েছে যারা স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ে নারীবাদী হয়েছে তারা অপপ্রচার চালায় যে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে। তাই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মিরাসসহ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। যা অযৌক্তিক, অবান্তর ও বিকৃত মানষিকতার বহিঃপ্রকাশ।

আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস তথা নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একদিন পুরোপুরি সফল এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এপ্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপদিতে এবং নারীর প্রকৃত অধিকার ও পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। তবেই এ দিবস উদযাপনের এবং নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন সার্থক ও সফল হবে।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক
সভাপতি, নাটোর জেলা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

রিকশা চালকদের আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে করনীয়

ড. আসগার ইবনে হযরত আলী

“ঘর থেকে বের হলে, বাজার থেকে সওদা নিয়ে সফর থেকে বাড়ি আসতে, সফরে গিয়ে ঘুরাফেরা করতে, সকাল থেকে সন্ধা, সন্ধা থেকে সকাল সর্বক্ষণ, সবল-দুর্বল, সুস্থ্য-রোগী, শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ বনিতারই নিত্য দিনের যানবাহন হচ্ছে রিকশা। বাসা থেকে রোগিকে নিকটবর্তি ক্লিনিক বা হাসপাতালে নিতে, হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরতে, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, অফিস-আদালতে যাতায়াত করতে, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ, জরুরি প্রয়োজনে চলাফেরা করতে রাস্তা-ঘাটে শ্রান্ত- ক্লান্ত হলে, শরীর অবশ হয়ে পাগুলো অচল হয়ে পড়লে, সামনে চলতে না চাইলে তখনও সাহায্যকারি বন্ধু হিসাবে সাহায্য করেন রিকশা চালক”।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও এখন অনেক নদীই মারা গিয়েছে। উজানে নদীতে কয়েকশ বাঁধ দিয়ে পানি সরায়ে নেয়ার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অধুনা নৌকার স্থান দখল করেছে রিকশা। বাংলাদেশের এমন কোন শহর, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, বন্দর নেই বললেই চলে যেখানে রিকশা নেই। অলিতে-গলিতে রাস্তা-ঘাটে, মোড়ে-মোড়ে, স্টেশনে, রাস্তার সর্বত্র যখন-তখন, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মে, এমনকি ধর্মঘট ও নির্বাচনের দিনেও সমস্ত যানবাহন বন্ধ থাকলেও তখনও রিকশার চাকা ঘুরে। “ঘর থেকে বের হলে, বাজার থেকে সওদা নিয়ে সফর থেকে বাড়ি আসতে, সফরে গিয়ে ঘুরাফেরা করতে, সকাল থেকে সন্ধা, সন্ধা থেকে সকাল সর্বক্ষণ, সবল-দুর্বল, সুস্থ্য-রোগী, শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ বনিতারই নিত্য দিনের যানবাহন হচ্ছে রিকশা। বাসা থেকে রোগিকে নিকটবর্তি ক্লিনিক বা হাসপাতালে নিতে, হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরতে, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, অফিস-আদালতে যাতায়াত করতে, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ, জরুরি প্রয়োজনে চলাফেরা করতে রাস্তা-ঘাটে শ্রান্ত- ক্লান্ত হলে, শরীর অবশ হয়ে পাগুলো অচল হয়ে পড়লে, সামনে চলতে না চাইলে তখনও সাহায্যকারি বন্ধু হিসাবে সাহায্য করেন রিকশা চালক”। সামান্য পয়সার বিনিময়ে আপামর জনতাকে

সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তারা, রিকশা চালকগণ- শ্রমিক, আর শ্রমিক বিধায় তারাও আল্লাহর বন্ধু। তারা সরল সহজ জীবন-যাপন করেন যা ঈমানদারদের একটি লক্ষণ। তারা কঠিন কষ্ট করে, নিজ দেহ ও শরীরকে খাঁটিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে রুজি রোজগার করেন। ফলে তাদের রুজি নির্ভেজাল ও হালাল। রসূলের বানী: "আপন হাতের কামাইয়ের চেয়ে উত্তম খাবার আর কেউ খায়নি। আল্লাহর রসূল হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জ করে আহার করতেন। (সহীহ বুখারী)

মহান আল্লাহর বাণী: 'লাক্বাদ খালাক্বনাল ইন্সানা ফী ক্বাবাদ' অর্থাৎ আমি মানুষকে কঠোর কঠিন পরিশ্রম করার জন্যই পয়দা করেছি।" (সূরাআল বালাদ-০৪)

সুতরাং রিকশা চালক ভাইদের কঠোর পরিশ্রম, তাদের জীবনকে আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে স্বার্থক করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধাকে যারা পরকালের বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে পারে শুধু তারাই দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করার যোগ্য। (সূরা আন নিসা-৭৪)

এহেন মানবতার বন্ধু, সরল-সহজ জীবনের অধিকারি, অল্পে তুষ্ট, কঠোর পরিশ্রমী মানুষই ইসলামি আন্দোলনের যোগ্য। এদেরকে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে সমবেত করা, সংগঠিত করা, উপযুক্ত সেবা-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্দোলনের সঙ্গি করা বর্তমান সময়ের দাবি।

রিকশা চালকদের রাজনৈতিক গুরুত্বঃ

১। রিকশা চালকদের সাথেই রিকশায় চড়ে দেশের সার্বিক অবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতার ব্যাপারে মতবিনিময় করা যায় এবং তাদের মন জয় করা, সমর্থন আদায় করা সহজ।

২। নির্বাচনের দিনে চূড়ান্ত মুহূর্তে আরোহিদের নিকট ভোট দানের আবেদন রাখতে পারেন, তাদের পছন্দের প্রার্থীকে।

৩। সকল রিকশা চালকদেরই পরিবার-আত্মীয় স্বজন আছেন, বিধায় তাদের লক্ষ লক্ষ ভোটও আছে।

৪। জনমত তৈরিতে, জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের বেলায় সর্বোপরি, মৌলিক ও মানবিক অধিকার আদায়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৫। রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে, জনসভা, সমাবেশ সফল করার ক্ষেত্রে তাদের অবদান প্রশংসনীয় হতে পারে।

রিকশা চালকদের মাঝে দাওয়াতে দ্বীনের কৌশলঃ

১। তাদেরকে সালাম দিলে, মুসাফাহা করলে, আলিঙ্গন করলে, হাসি মুখে বুকে জড়ালে, গ্যারেজে, মেসে বা বাস স্থানে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করলে, খোজ-খবর নিলে তারা খুশি হন।

২। নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতঃসন্তানদের লেখা-পড়ার গুরুত্ব বুঝানো ও পরামর্শ দেয়া, তার শুভাকাঙ্খি হওয়া চাই।

৩। রিকশায় চড়ে উচিৎ ভাড়ার চেয়ে ৫/১০ টাকা বেশি দেয়া দরকার।

৪। মেসে, গ্যারেজে তাৎক্ষনিক ভাবে কিংবা সময় দিয়ে জড়ো করে সাবধান ও সতর্ক করলে, পরকালীন কঠিন আজাবের কারণ ও তার থেকে নাযাত ও মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং জান্নাতের নাজ-নেয়ামত লাভের সু-খবর দিতে হবে।

৫। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত কবুল করলে সহজ ও ছোট ছোট যুক্তিপূর্ণ বই পড়তে দেয়া। (যারা শিক্ষিত তাদেরকে)

৬। হাদীসের সহজ বাংলা অনুবাদ ও কুরআনের তরজমা দিয়ে পড়তে বলা ও অশিক্ষিতদের পড়ে শোনাতে বলতে হবে।

৭। সাপ্তাহিক বৈঠকে দাওয়াত দেয়া, তরবিয়াত দিয়ে মাসলা-মাসায়েল, নামাজের সূরা ও দোয়া শিক্ষা দেয়া।

৮। সামষ্টিক পাঠ ও সামষ্টিক ভোজে অংশ গ্রহণ করানো।

৯। নিরক্ষরদেরকে শিক্ষিতদের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, ব্যাপক সেবা-সাহায্য করা রিকশা চালকদের মাঝে।

১০। সমাজ সেবার জন্য প্রতিদিন ২ টাকা ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বা স্বাবলম্বী করার জন্য ১০ টাকা করে জমা নেয়া।

১১। বাজার, গ্যারেজ, মেস ভিত্তিক কমিটি গঠনকরা, যাকে বলা হয় পেশা ভিত্তিক কমিটি।

১২। কমিটির সদস্যদের নিজেদের ও তাদের দিয়ে তাদের সহকর্মি বন্ধু-বান্ধবদের ডি-ফরম পূরণ করানো এবং থানা ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফরম পূরণ হলেই উনিয়ন রেজিঃকরা।

১৩। সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা, অসুস্থ্য হলে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় সেবাকরা। পরিবারের লোকদের খাবারেরব্যবস্থা কর।

১৪। জমাকৃত টাকা তাদের ৩ জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকে জমা করা এবং প্রয়োজনীয় পুঁজি হলে রিকশা কিনে লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহজ কিস্তিতে বিলি করা। অর্ধেক জমা নেয়া ও নগদ এককালিন সম্ভব হলে ১০/২০ হাজার টাকা নেয়া, মূল্য পরিশোধ হলে রিকশার মালিক কে দেয়া। পূণঃরায় প্রয়োজনীয় পুঁজি হলে অনুরূপে নতুন সদস্য এর মাঝে রিকশা বিতরণ করা। এভাবে বারবার রিকশা বিতরণকরা। পর্যায়ক্রমে সকল সদস্যদের রিকশার মালিক করা (একটিকরে)।

১৫। শর্তারোপ করা যে, ফজর পড়ে রিকশা বেড়করা ও জমা দিয়ে গ্যারেজেই জামায়াতের সহিত এশার নামাজ পড়ে ২/১ টি হাদিস/কুরআনের আয়াত শুনিয়ে দেয়া।

১৬। সপ্তাহে/মাসে ১ দিন ২/৩ ঘন্টা শিক্ষা বৈঠক করে গোস্ত দিয়ে খিচুরি/ডাল ভাত খাবারের আয়োজন করা।

রিকশা চালকদের বাস্তব সমস্যা ও সমাধানঃ

১। রিকশা দাঁড়াবার কোন স্টপেজ নেই, ফলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রিকশা পার্কিং হয়, এতে বহু রিকশা চুরি হয়। চালকদের বাড়ি ঘর বিক্রি করে হারানো রিকশার দাম চুকাতে গিয়ে সর্বশান্ত হতে হয়।

২। কারণে-অকারণে ট্রাফিক পুলিশ রিকশা চালক বন্ধুদেরকে বিধি-বহির্ভূতভাবে মারধর করে থাকে যা অমানবিক, অমানুষিক, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা, তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে বহু রিকশা চালক রাজ পথেই প্রাণ হারান। তাছাড়া পাষন্ড, বজ্জাত ধরনের কিছু যাত্রি রয়েছে যারা ভাড়া কম দেয়। প্রতিবাদ করলে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ও মারধর করে। বাপ-দাদার বয়সের লোকদের গায়েও হাত তুলে যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। জগৎ বড় নির্মম যাচাই কারি। কোন বদ প্রকৃতির যাত্রিতো দুরের কথা, কোন ট্রাফিক পুলিশকেও সরকারি আইনে শারিরীক নির্যাতন ও আঘাত করার অধিকার দেয়া হয়নি। তারপরও অন্যায় ভাবে রিকশা চালক ভাইদেরকে লাঞ্চিত করে, গালিগালাজ করে, মারধর করে। এর প্রতিকার পেতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হবে, সঞ্চয়ী মনোভাব থাকতে হবে। সংঘবদ্ধ হয়ে সরকার থেকে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিঃ করতে হবে। অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে, জালিমদেরকে প্রতিহত করতেহলে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর দিতে হলে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প নেই। রেজিঃইউনিয়নের সদস্যের উপর কোন অপশক্তি যুলুম করলে, সরকারি খরচে সরকার নিজে বাদি হয়ে ঐ অপশক্তিকে শাস্তির আওতায় এনে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি দিয়ে থাকে।

কাজেই দুনিয়ার রিকশা চালক ভাই ও বন্ধুগণ ঐক্যবদ্ধ হোন। রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদে যোগদিন। সকল প্রকার যালিম, শোষক-শাষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। মনে রাখবেন- "জগৎ শক্তের ভক্ত নরমের যম "কাজেই শক্তি সঞ্চয় করুন, চিরকাল রিকশা চালক না থেকে রিকশার মালিক হোন।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ
সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কৃষিতে ইসলামের অবদান

কৃষিবিদ মুহাম্মদ রাকিব হাসান

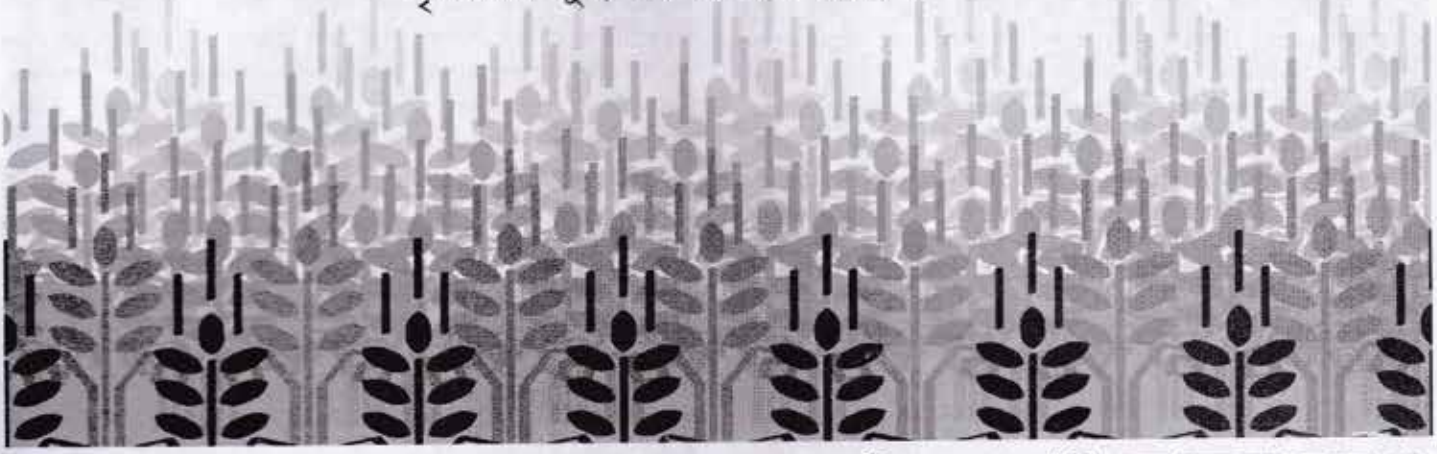

কৃষি হচ্ছে মূলত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাদ্য এবং তন্তু উৎপাদনের বা সংগ্রহের সুসংগঠিত পদ্ধতি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কৃষি সব সময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, কারণ বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগতি অন্যতম প্রধান নিয়ামক। শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজে নিয়োজিত ছিল। নিত্যনতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ফলে কৃষিজ উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সমস্ত কলাকৌশল নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পেছনে ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে অনেক বিষয় কৃষির অন্তর্ভুক্ত, এর প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. কৃষিবিদ্যা (চারা উৎপাদন, রোপণ এবং ফসল সংগ্রহ)
২. পশুপালন বিদ্যা
৩. মৎস্যবিজ্ঞান
৪. উদ্যানপালন বিদ্যা (স্বল্প পরিসরে ফুল, ফল, সবজি চাষ)

এ সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটিরই আবার অনেকগুলো শাখা রয়েছে; যেমন কৃষিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম চাষাবাদ পদ্ধতি, পশুপালনবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত রেঞ্জিং (নির্দিষ্ট একটি প্রজাতির পশুপালন পদ্ধতি)। কৃষিবিদ্যার উন্নয়ন এবং বিবর্তনের ফলে নতুন অনেক কৃষিপণ্য তৈরি হয়েছে যেমন: পশুখাদ্য (স্টার্চ, স্যুগার, এলকোহল ও রেজিন), তন্তু (তুলা, পশম, শন), ফ্লাড (লিলেন কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত) এবং রেশম জ্বালানি (জৈবপণ্যজাত মিথেন, ইথানল, বায়োডিজেল), পাতাবাহার, কাটফ্লাওয়ার (কাটার অনেকক্ষণ পরেও সতেজ থাকে এমন ফুল) এবং অন্যান্য নার্সারীর উদ্ভিদ। সকল নবী-রাসূল কৃষি পেশায় জড়িত ছিলেন। কৃষিকাজ কোন নীচু বা অপমানজনক পেশা নয়। প্রাচীনকালে এ পেশায় সমাজের শ্রেষ্ঠ, শিক্ষিত ও ভদ্র শ্রেণির মানুষ কম-বেশি জড়িত ছিলেন। এমনকি সকল নবী-রাসূল এ কাজে জড়িত ছিলেন মর্মে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন: 'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি।' সাহাবীগণ বললেন: আপনিও (কি এ কাজ করেছেন)? রাসূল (সা.) বললেন: আমিও কয়েক কিরাত (পারিশ্রমিক) এর বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরিয়েছি। (বুখারী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ, সু-প্রসিদ্ধ কয়েকজন নবী-রাসূলের কৃষি কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো: ০১. **আদম (আ:)ঃ** পৃথিবীর আদি মানব আদম (আঃ) থেকেই কৃষি কাজের সূচনা হয়। কৃষি কাজসহ তাকে পৃথিবীর সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, আর আল্লাহ আদম (আঃ) কে সবকিছুর নাম শিখালেন। (সূরা বাকারা: ৩২)। ইবনু কাছির বলেন: 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্তুর ইলম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া) সর্বপ্রথম আদম (আঃ) এর প্রতি যেসব অহী নাযিল করা হয়েছিলো, তার অধিকাংশ বিধানই ছিলো ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহণের জন্য চাকা চালিত গাড়ি সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-ই আবিষ্কার করেন। (হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, আত্-তিব্বুন নাবুবী) ইবনু খালদূন বলেন: আদম (আঃ) কে কৃষিকার্য, আগুনের ব্যবহার ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। (আল মুকাদ্দিমা) আদম (আঃ) এর যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য ছিলো 'তীন' (ডুমুর) ফল। ফিলিস্তীন ভূখন্ড থেকে সম্প্রতি সে যুগের একটি আস্ত তীন ফলের শুস্ক ফসল পরীক্ষা করে একথা প্রমাণিত হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি সূরার নাম হলো 'আত্ তীন'।

০২. নূহ (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজ ঃ ঐতিহাসিকদের মতে, নূহ (আঃ) হলেন আদম (আঃ) এর অষ্টম বা দশম পুরুষ। তিনি সামগ্রীকভাবে কৃষি কর্মে জড়িত ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় কুফরির চরমসীমা লঙ্ঘন করে। সুপথে ফিরে আসার জন্য তিনি তাদেরকে বার বার আহ্বান জানান, পরিশেষে সুপথে ফিরে না আসলে মহাপ্লাবনে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে মর্মে তিনি তাদেরকে সতর্কও করেন কিন্তু তারা এ দিকে কর্ণপাত করে নি। প্লাবন শুরুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) কে আদেশ করলেন– "আপনি জোড়াবিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" (সূরা হুদ: ৪০)। নূহ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বেঈমান কাফেরদেরকে বাদ দিয়ে ঈমানদার নারী-পুরুষ ও গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এবং অতীব প্রয়োজনীয় অন্যান্য জীব-জন্তু, পশু-পাখী নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেন। এদিকে কাফেররা মহাপ্লাবনে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে সলিল সমাধি হয় আর নূহ (আঃ) এর নৌকা বর্তমান ইরাকের মুসেল শহরের উত্তরে ইবনু উমর দ্বীপের অদুরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত 'জুদী' পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ে। এখানে নতুন করে তিনি আবার চাষাবাদ শুরু করেন। তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা

মতে, তুফানের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিলো, তা ছিলো যয়তুন (তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন)। আল্লাহ তা'আলা 'যায়তুন' এর শপথ করে বলেছেন: কসম 'তীন ও যায়তুন' এর, কসম 'সিনাই' পর্বতের, কসম এই নিরাপদ নগরীর। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। (সূরা আত্ তীন: ১-৪)

০৩. ইদরীস (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজ ঃ আল কুরআনে ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে– এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছি। (সূরা মারয়াম: ৫৬-৫৭)। ইদরীস (আঃ) হলেন সর্ব প্রথম মানব, যাকে মু'জেযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংক বিজ্ঞান দান করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখা, বস্ত্র সেলাই, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। (তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন)। তার সময়ের কৃষি কাজ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও ঐতিহাসিক সূত্রে এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি মানুষকে হাতে-কলমে কৃষিকাজের কলা-কৌশল শিক্ষা দিতেন।

০৪. হুদ (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজঃ হুদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- আমি 'আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদ (আঃ) কে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় করো না। (সূরা আশ শু'আরা: ১৩২-১৩৪)। হুদ (আঃ) এর জাতি আ'দ নামে পরিচিত। আম্মান থেকে হাযরামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসবাস ছিলো। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য-শ্যামল ছিলো। প্রায় সব রকম বাগ-বাগিচা ছিলো তাদের। যে বিশ্ব প্রতিপালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। তারা শক্তি মদমত্ত হয়ে 'আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে আছে? বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে হুদ (আঃ) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একাত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্য্যের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত শুস্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অত:পর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগ-বাগিচা ও দালান-কোঠা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূণ্যে উড়তে থাকে। অতপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। (মা'আরেফুল কুরআন)। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, হুদ (আঃ) এর জাতি তাদের অসৎ কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হয়েছিলো বটে, তবে সে সময়ে কৃষি কাজের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিলো। ফলে তাদের খেত-খামার, বাগ-বাগিচা কৃষি ফল-ফসলাদিতে ভরপুর ছিলো।

০৫. সালিহ (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজঃ সালিহ (আঃ) এর জন্ম হয় সামূদ সম্প্রদায়ে। আল কুরআনে বলা হয়েছে: সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালিহকে। (সূরা আল আ'রাফ: ৭৩)। সামূদরা আদ জাতির মতো শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিলো। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিলো। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানারূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করতো। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজো বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরাম ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে। সমাজের এই শক্তিশালী শ্রেণি তাদের নবী সালিহ (আঃ) কে অমান্য করে মূর্তিপূজাসহ নানাবিধ শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত হলো এবং সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকলো। মু'জিযার মাধ্যমে প্রাপ্ত উষ্ট্রিকে হত্যা করে তারা সালিহ (আঃ) কেও হত্যা চেষ্টার মতো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহর ভাষায়– "তারা হেদায়াতের চাইতে অন্ধত্বকেই পছন্দ করে নিলো। অত:পর তাদের কৃতকর্মের ফলে অবমাননাকর শাস্তির গর্জন এসে তাদের পাকড়াও করলো।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ: ১৭)। ফলে তারা এক যোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হলো (সূরা আল আ'রাফ: ৭৮, হূদ: ৬৭-৬৮) এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হলো এমনভাবে, যেনো তারা কোন দিন সেখানে ছিলো না। অন্য আয়াতে এসেছে যে, আমরা তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ পাঠিয়ে ছিলাম। তাতেই তারা শুস্ক খড়কুটোর মতো হয়ে গেলো। (সূরা আল কামার: ৩১) সালিহ (আঃ) এর সময়ে কৃষি কাজের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। ফলে শস্যক্ষেত্র, ফল-ফসলের বাগ-বাগিচা, নাযুক ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগান, পশুপালন ইত্যাদি কাজে প্রচুর মানুষের সম্পৃক্ততা ছিলো।

০৬. ইবরাহীম (আঃ)ঃ ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তখন কালেডীয় জাতি বসবাস করতো। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন নমরূদ। যিনি তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট ছিলেন। প্রায় চারশো বছর তিনি রাজত্ব করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে 'উপাস্য' হবার দাবী করেন। আল্লাহ তারই মন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিত 'আযর' এর ঘরে বিশ্বনেতা ও বিশ্ব সংস্কারক নবী ইবরাহীম (আঃ) কে মুখ্যত: কালেডীয়দের প্রতি প্রেরণ করেন। কালেডীয় সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিলো। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করতো। কিন্তু অসীলা পূজার রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা আল্লাহকে পাবার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও তারকাসমূহের পূজা করতো। ইবরাহীম (আঃ) উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরূদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন। ফলে সমাজ সংস্কার হিসেবে তাঁকে জীবনের প্রতি পদে পদে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মূখীন হতে হয়। ইবরাহীম (আঃ) এর দু'আর বরকতে ও তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় মক্কার বিজন মরুভূমির বিশাল এলাকা ফল-ফসল ও শস্যক্ষেতে পরিণত হয়েছিলো। তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করেন: হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামন্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভুহে! যাতে তারা সালাত কায়েম করে। কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান কর। আশা করি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (সূরা ইবরাহীম: ৩৭) অন্য আয়াতে এসেছে: হে আমার রব! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত করো এবং এর অধিবাসীদেরকে তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান করো। (সূরা আল বাকারা: ১২৬)। ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসামঈল ও ইসহাক (আঃ) ও কৃষি কাজে আত্ম-নিবেদিত ছিলেন। তবে তাদের কৃষিকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা বিশুদ্ধ তথ্যে পাওয়া যায় না।

০৭. ইউসুফ (আঃ)ঃ ইউসুফ (আঃ) এর পিতা ছিলেন ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)। তাঁরা সবাই কেনআন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র সম্ভ্রান্ত, তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত, তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত। তাঁরা হলেন– ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকুব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ আলাইহিমুস সালাম (তিরমিযী, মিশকাত)। ইউসুফ (আঃ) অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার সম্মূখীন হয়েছিলেন। শৈশবে ফুফু ও পিতার স্নেহের দ্বন্দে ফুফুকর্তৃক চুরির অপবাদ অতপর শাস্তিস্বরূপ ফুফুর দাসত্ব বরণ করেন। ভ্রাতাদের ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার কবলে পড়ে অন্ধকূপে নিক্ষিত হন। ক্রীতদাস হিসেবে 'আযীযে মিসর' কিতফীরের গৃহে পদার্পন করেন। যৌবনে গৃহস্বামীর স্ত্রী যুলায়খার কু-নযরে পড়ে ব্যাভিচার চেষ্টার মিথ্যা অপবাদে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মিসরের সর্বোচ্চ পদে সু-সম্মানে আসীন হোন। আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন (সূরা ইউসুফ: ৬)। আল-কুরআনের ভাষ্যমতে, মিসরের বাদশাহ স্বপ্নে দেখেন যে, "সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী

খেয়ে ফেলছে।" তিনি স্বপ্নে আরো দেখেন– "সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুষ্ক শীষ।" বাদশাহ তার সভাসদস্যগণকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তারা এটাকে 'কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন' বলে আখ্যায়িত করে। (সূরা ইউসুফ: ৪৩-৪৪) অবশেষে বাদশাহ স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা জানার জন্য তার এক খাদেমকে ইউসুফ (আঃ) এর কাছে পাঠান। ইউসুফ (আঃ) বলেন: "তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতপর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকী ফসল শীষ সমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তখন তোমরা খাবে ইতোপূর্বে যা রেখে দিয়েছিলে, তবে কিছু পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা (বীজ বা সঞ্চয় হিসেবে) তুলে রাখবে। এরপরে আসবে এক বছর, যাতে লোকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন তারা (আংগুরের) রস নিংড়াবে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ফসল হবে।" (সূরা ইউসুফ: ৪৭-৪৯)। ইউসুফ (আঃ) এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ায় তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর দেশব্যাপী ব্যাপক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নেন। তাঁর নির্দেশক্রমে উদ্বৃত্ত ফসলের বৃহদাংশ সঞ্চিত রাখা হয়। এতে বুঝা যায় যে, আধুনিক কালের এলএসডি, সিএসডি খাদ্য গুদামের অভিযাত্রা বিগত দিনে ইউসুফ (আঃ) এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিলো।

০৮. মূসা (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজঃ মূসা (আঃ) হলেন ইবরাহীম (আঃ) এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। তার আমলে অসংখ্য মানুষ ক্ষেত- বাগানের কৃষিকাজে ও পশু পালনে অভ্যস্ত ছিলো। আল কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে– তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে চলার পথসমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তোমরা তা আহার করো ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাকো। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে। (সূরা ত্ব- হা: ৫২-৫৪)। মূসা (আঃ) নিজে দশ বছর মাদয়ানে গৃহপালিত পশু তথা ছাগলের রাখালের কাজ করেন। লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তিনি ছাগলকে খেতে দিতেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ ও মূসা (আঃ) এর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে এভাবে: (আল্লাহ বলেন:) হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? সে (মূসা) বললো: এটি হচ্ছে আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই, আবার কখনো তা দিয়ে আমি আমার মেষের জন্য গাছের পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে। (সূরা ত্ব-হা: ১৮-১৯)

০৯. দাউদ (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজঃ দাউদ (আঃ) শস্য বপন, কর্তন ও কৃষি যন্ত্র তৈরি এবং আত্মরক্ষার্থে বর্ম নির্মাণ শিল্পে অভিজ্ঞ ছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আঃ) এর সময়কার কৃষি অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে সে সময়কার একটি ঘটনা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য রাসূল (সাঃ) কে এ মর্মে বলেন, দাউদ ও সুলাইমানের ঘটনাও (তাদেরকে শোনান), যখন তারা একটি ক্ষেতের ফসলের (মোকাদ্দমায়) রায় প্রদান করেছিলো। (মোকাদ্দামাটি ছিলো এমন), রাতের বেলায় (মানুষদের) কিছু মেষ (অন্য মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে) তা তছনছ করে দিলো, এ বিচারপর্বটি আমি নিজেও পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অতপর আমি (সঠিক রায় যা) তা সোলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়া: ৭৮-৭৯)।

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দু'জন লোক দাউদ (আ.) এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিলো ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করলো যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সম্ভবত: বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিলো এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিলো তাই দাউদ (আঃ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার ছাগলগুলো শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। বাদী-বিবাদী উভয় দাউদ (আঃ) এর আদালত থেকে বের হয়ে আসলে দরজায় তাঁর পুত্র সুলাইমান (আঃ) এর সাক্ষাত হয়। তিনি মোকাদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। সুলাইমান (আঃ) বললেন: আমি রায় দিলে তা ভিন্ন মত হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদ (আঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। দাউদ (আঃ) বললেন: এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্যে উপকারী রায়টা কী? সুলাইমান (আঃ) বলেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বে অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন শস্যক্ষেত্র ক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পণ করবে। দাউদ (আঃ) এ রায় পছন্দ করে বলেন: বেশ! এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়কে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। কুরআনে বর্ণিত এ ঘটনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, দাউদ (আঃ) এর সময় চাষাবাদ, পশু পালন ইত্যাদির প্রচলন ছিলো। তিনি স্বয়ং এ কাজে জড়িত ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে শস্যক্ষেত নষ্ট করা চরম অন্যায় ও গর্হিত কাজ। এ অন্যায় কাজে জড়িতদের সুষ্ঠু বিচারের আওতায় আনা হবে। এ ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত ও সুষ্ঠু বিচার না পেলে বাদী আপিল করার সুযোগ পাবেন।

১০. সুলাইমান (আঃ) এর যুগে কৃষিকাজঃ সুলাইমান (আঃ) হলেন দাউদ (আঃ) এর পুত্র। তিনি সাবা' গোত্রভূক্ত ছিলেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিলো একটি নিদর্শন: দু'টি উদ্যান– একটি ডানে ও অপরটি বামে। (তাদেরকে বলা হয়েছিলো) তোমরা তোমাদের রবের রিয্ক থেকে খাও আর তাঁর শোকর করো। এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের) রব ক্ষমাশীল। তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম। আর আমি তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত ফলের গাছ, ঝাউগাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ। (সূরা সাবা': ১৫-১৬)।

আল কুরআনের এ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সাবা' সম্প্রদায় দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত মাআরেব নগরে বসবাস করতো। দেশের সম্রাট উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভান্ডার তৈরি করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয়, যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরে দরজা খুলে পানি ছাড়া হতো। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হতো। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেতো। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আঁধার নির্মাণ করা হয়েছিলো। এতে পানির বারটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছোনো হয়েছিলো। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হতো এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাতো। শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফল-মূলের বাগান তৈরি করা হয়েছিলো। এসব বাগানে নানা রকম বৃক্ষ হতে প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল উৎপন্ন হতো। কাতাদাহ (রাঃ) প্রমূখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেতো, হাত লাগানোর প্রয়োজন হতো না। (তাফসীল ইবনে কাছীর) উপর্যুক্ত আয়াত ও তাফসীর হতে জানা যায় যে, সুলাইমান (আঃ) এর সময়ে কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিলো। সে সময়ে খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ করে তথা কৃত্রিমভাবে সেচ প্রয়োগ করে কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়েছিলো।

১১. মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগে কৃষিকাজ: সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ও কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজে 'জারিফ'

নামক স্থানে কৃষি ফসলাদি উৎপাদন করেছেন বলে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। তিনি কৃষি ও কৃষকের প্রতি ছিলেন যত্নবান। ছাগল চরানো, গৃহপালিত পশু পালন, কূপ থেকে পানি উত্তোলন, পরিখা খনন, জ্বালানী সংগ্রহ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজ তিনি নিজ হাতে করেছেন। কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থা ও কূপ খননের প্রতিও তিনি সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) নিজ হাতে খেজুর গাছ রোপণ করেছেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জমিনের প্রচ্ছন্ন ভান্ডারে খাদ্য অন্বেষণ কর।' জাহিলী যুগে মক্কাবাসীরা কৃষিকে একটি হীন কাজ বলে মনে করলেও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুহাযির সাহাবীগণ মদীনায় আসার পর আনসার সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের মুহাযির ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এতে রাজি হলেন না। অতপর আনসার সাহাবীগণ আরয করলেন, তাহলে তারা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশগ্রহণ করুক। আমরা তাদেরকে আমাদের ফসলের অংশীদার করে নিবো। মুহাযির সাহাবীগণ আনসারদের এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন। অতঃপর মদীনার এমন কোনো মুহাযির পরিবার ছিলো না, যারা এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ ফসলের উপর কৃষি কাজ করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী আলী, সা'দ ইবনু মালিকসহ অনেক সাহাবী এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ফসলের উপর কৃষি কাজ করতেন। (বুখারী) কৃষি কাজ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর কয়েকটি অমূল্য বাণী- তোমরা জমির লুকায়িত ভান্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান করো। (তাবারানী) কারো নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন। (বুখারী)। এটা দুর্ভিক্ষ নয় যে, তোমরা বৃষ্টি পাও না; কিন্তু এটা দুর্ভিক্ষ যে, তোমরা বৃষ্টির উপর বৃষ্টি পাও, অথচ ভূমিতে কিছু জন্মাও না। (মুসলিম) যার জমি আছে, সে যেনো নিজেই তা চাষ করে। (বুখারী) যদি কেউ জমি থাকা সত্ত্বেও নিজে চাষ করতে না পারে, তাহলে তা (অনাবাদী না রেখে) মজুরের দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করবে অথবা কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগদখল করতে দিবে। (মুসলিম) উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, কৃষিকে হীন বা নীচু মানের কাজ মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এ কাজে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ নিয়োজিত ছিলেন। এ কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের প্রতি ইসলামে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূলত: এ কাজে জড়িত মানুষেরাই খাদ্য উৎপাদন করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং উদ্ভিদরাজি ও বৃক্ষরোপন করে পৃথিবীর ভারসাম্য ও অস্তিত্ব রক্ষায় অবদান রাখছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মাতৃভূমির কথাই যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে– এ পেশায় জড়িত কৃষকরাই মূলত: দেশ গড়ার প্রকৃত সৈনিক হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ভান্ডারের যোগান দিচ্ছেন এবং দেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন এমনকি দেশের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বৈশ্বিক অর্থনীতির সূচনা হয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে; যার ফলে অনেক খাদ্যশস্য এবং কৃষি প্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের বাইরে থেকেও অনেক খাদ্যশস্য এবং কৃষিপ্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বে আসে। আফ্রিকা, চীন এবং ভারত থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আনা হতো। এই সময়ে বিপুল পরিমান খাদ্যশস্যের যে স্থানান্তর ঘটে সেটাকে অনেক লেখক খাদ্যশস্যের বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করেছেন।

সালফে সালেহিন ও খলিফাদের কৃষির প্রতি গুরুত্ব: সালফে সালেহিন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন কৃষি উন্নয়নে খুব মনোযোগী ছিলেন। হজরত ওসমান (রা.) কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি বৃদ্ধ বয়সে বৃক্ষরোপণ করছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, সৎকর্মরত অবস্থায় আমার মৃত্যু হওয়া ফাসাদরত অবস্থা থেকে উত্তম। একবার আবু দারদা (রাঃ) আখরোট গাছ রোপণ করছিলেন। তখন তাকে বলা হলো, আপনি বৃদ্ধ বয়সে এটা কেন লাগাচ্ছেন? অথচ এর ফল পেতে ২০ বছর (অর্থাৎ অনেক) সময় লাগবে। তিনি উত্তর দিলেন, আজর তথা প্রতিদান ব্যতীত আমার অন্য কোনো চাহিদা নেই। (নুজহাতুল আনাম, পৃ. ১৮৫)। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ধনী হওয়া সত্ত্বেও মাঠে কোদাল নিয়ে নিজ হাতে পানি সেচনের ব্যবস্থা করে দিতেন। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) সর্বপ্রথম মদিনার জমিতে গম চাষ করেন। এত বিশাল এলাকাজুড়ে চাষাবাদ করেন যে, উৎপন্ন শস্য মদিনাবাসীর এক বছরের খোরাকি হয়ে যেত। ফলে সিরিয়া থেকে খাদ্যশস্য আমদানি নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। (তারিখে দিমাশক : ২৫/১০২)। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) চাষাবাদকে আত্মমর্যাদার কর্ম হিসেবে গণ্য করতেন। (আততারাতিব ইদরাকিয়্যাহ : ২/৫১)। অথচ পরিতাপের বিষয়, আজকের নতুন প্রজন্ম কৃষিকে নিম্নমানের পেশা হিসেবে গণ্য করে। যে কর্মের ওপর ভিত্তি করে মানবসভ্যতা টিকে আছে তাকে অবজ্ঞা করে। ফলে মুসলিম দেশগুলোর ভূমি চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উর্বর হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যপণ্যে আমাদের অমুসলিমদের ঘরে হাত পাততে হয়। তাদের থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। এ পরনির্ভরতা কবে শেষ হবে?

কৃষি উন্নয়নে খলিফা-আমিরদের অবদান: হিজরি প্রথম শতকে ইসলামী সাম্রাজ্য অর্ধজাহানে বিস্তৃত হয়। এরপর থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে উমাইয়া, আব্বাসিয়া, উসমানিয়া খলিফারা পৃথিবী শাসন করেছেন। এসব খেলাফতের আমির সর্বদা কৃষি উন্নয়নে সুনজর দিয়েছেন। কীভাবে মুসলিমদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, সে চিন্তায় বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কৃষক ও চাষাবাদের সুবিধাকল্পে বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। খালবিল খনন, সাঁকো ও বাঁধ নির্মাণ, মাজরা তথা পানি নিষ্কাশন পথ পরিষ্কারকরণ, ভূগর্ভ থেকে সহজে পানি উত্তোলন মেশিন স্থাপনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শুধু বসরা নগরীতেই নাকি ১ লাখ ছোটবড় নালা ছিল। যেগুলো দিয়ে সহজে পানি প্রবাহিত হতো। অনেক নালা খননকারীর নামে নামকরণ করা হতো। খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী কর্তৃক খননকৃত 'নহরে যুবাইদা' ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এসব কাজে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। কৃষক-বণিকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) 'নহরে সাদ' খননের প্রস্তুতি নেন। এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। খননকার্য কিছুদূর এগুনোর পর বিশাল এক পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন খননকার্য বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস সাকাফি (তার যুগে) আবার খননকার্য শুরু করেন। তিনি এবার তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা দেখো খননকর্মীদের দৈনিক খাবারের মূল্য কত? যদি খাদ্যের ওজন একজন শ্রমিকের খননকৃত পাথরের ওজনের সমপরিমাণও হয় তবুও তোমরা খননকার্য বন্ধ করবে না। (সেই পরিমাণ মূল্য আমি দেব) পরবর্তী সময় বিশাল অর্থ ব্যয় করে নহরটি খনন করা হয়। (মুজামুল বুলদান : ৫/৩২১)। প্রাকৃতিক নালার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম নালা ছিল। যেগুলোর মাধ্যমে কৃষক সহজে ক্ষেত সিঞ্চন করতে পারতেন। মধ্যযুগে খলিফাদের এসব কর্ম আধুনিক পানি-বিশেষজ্ঞদের বিস্ময়ান্বিত করেছে।

কৃষককে সম্মান প্রদানঃ খলিফারা কৃষককে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য অনুদান দিতেন। কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে যেন অর্থ সংকটে না পড়তে হয় এজন্য কর মওকুফ করে দিতেন। অনেক স্থানে শস্য ঘরে তোলার পর কর আদায় করা হতো। হজরত ওমর (রাঃ) বলতেন, তোমরা কৃষকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (অর্থাৎ তাদের প্রতি জুলুম করো না)। হজরত আলী (রাঃ) কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশনা প্রেরণ করেন যে, তোমরা এক দিরহাম করের জন্য কৃষককে প্রহার করো না। খলিফা জিয়াদ বিন আবিহ কর্মচারীদের বলেন, তোমরা কৃষকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা তারা যতদিন মোটাতাজা থাকবে তোমরাও ততদিন মোটাতাজা থাকতে

পারবে। (অর্থাৎ সুখে থাকবে)। (তাসহিলুন নজর, পৃ. ১৫৯)। অনেক খলিফা কৃষকের ফসল উৎপাদনের আগেই অগ্রিম আর্থিক অনুদান দিতেন। যেন তারা সহজে চাষাবাদ করতে পারে। (মুজামুল বুলদান : ২/২৭৪)। যুদ্ধকালীন মুসলিম সেনাপতি সৈন্যদের কঠোরভাবে নিষেধ করতেন যেন তারা কোনো ফসলি জমিন নষ্ট না করে। ক্ষেতখামারে অগ্নিসংযোগ না করে। একজন কৃষক যে ধর্মেই হোক না কেন, তাকে যেন আক্রমণ না করা হয়। খলিফা-আমিরদের এমন সহযোগিতায় কৃষক আনন্দচিত্তে চাষাবাদ করত। খলিফারা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, কৃষকের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাবে দেশের অর্থনীতি তত চাঙ্গা হবে। বায়তুল মালে বেশি অর্থভান্ডার সঞ্চয় হবে। পূর্বসূরীদের কৃষিকর্মে এত মনোযোগিতার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই, তাদের দৈনন্দিন খাবারের জোগান নিজেরাই উৎপাদন করতেন। মুসলিম বিশ্বের খাদ্যচাহিদা নিজেদের ভূমিতেই যথেষ্ট ছিল। জনৈক ইতিহাসবিদ বলেন, 'তদানীন্তন মুসলিম বিশ্ব বাইরে থেকে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করেছিল, এ তথ্য আমি কোথায় খুঁজে পাইনি।' (আহমদ আমিন, জহরুল ইসলাম : ২/২৪৬)। এছাড়াও ততকালীন মুসলিম পন্ডিতরা চাষাবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লিপিবদ্ধ করেছেন। মানুষের আগ্রহের কারণে এটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হয়, যা 'ইলমুজ জিরাআহ' (কৃষিবিদ্যা) নামে পরিচিতি লাভ করে। মাটির প্রকারভেদ, শস্যবীজ উৎপাদন পদ্ধতি, ভূগর্ভস্থ থেকে পানি উৎসারণ পদ্ধতি, বিভিন্ন শস্য, শাকসবজি ও ভেষজ ফলের পরিচয়সহ চাষাবাদের নিয়মকানুন নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়। উমাইয়া-আব্বাসি যুগের গ্রন্থভান্ডার এর সাক্ষী। সুতরাং এ দাবি অতিরঞ্জন নয় যে, আজকের পশ্চিমারা আধুনিক কৃষিবিদ্যাকে মধ্যযুগের মুসলিম পন্ডিতদের লিখিত বই থেকেই ধার করে নব আকৃতিতে প্রকাশ করেছে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়রা যখন খিলাফতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তারা দামেস্ক থেকে মধ্য মেসোপটেমিয়ার ছোট্ট সাসানিয় শহর (মুসলিমদের অধীনে আসার আগে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) বাগদাদে খিলাফতের রাজধানী স্থানান্তর করেন। ইউরোপের শহর, নগর এবং অন্যান্য স্থাপনাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে সেগুলো ডাকাত এবং অন্য সাম্রাজ্যের সেনা অভিযান থেকে সুরক্ষিত থাকে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো চার কোনায় খুব দুর্বল ছিল। যদি দেয়ালের এই চার কোণায় পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সেগুলো ভেঙ্গে যাবে এবং যোদ্ধারা সহজেই সেই ফাটল দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। সর্বপ্রথম বৃত্তাকার শহরে বাগদাদকে রূপান্তরিত করে আব্বাসীয়রা এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুর (৭৫৪-৭৫ খ্রিঃ) নতুন রাজধানীকে বৃত্তাকার দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত করে ফেলেন। খিলাফতের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন সরকারী কাজের জন্য এবং ব্যবসার তাগিদে রাজধানীতে আস্তে লাগলো, যার ফলে ৫০ বছরের মধ্যে বাগদাদের জনসংখ্যা প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে যায়। এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগকারী একটি বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় বাগদাদ। খলীফা হারুন-আর রশীদের (খলিফা মনসুরের দৌহিত্র) সময়কালে (৭৮৬-৮০৬) বাগদাদ কন্সটান্টিনোপলের পরে দ্বিতীয় বৃহৎ নগরীতে পরিণত হয়। বাগদাদের নিরপত্তা নিশ্চিত করার পর আব্বাসীয়রা ভাবতে লাগলো কিভাবে খিলাফতের বিপুল পরিমাণ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। আব্বাসীয়দের সময়ে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ পানির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হওয়া শুষ্ক আরব ভূমিতে কখনোই পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। নিজেদের ভূখন্ডে উৎপাদিত খেজুর এবং সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত ছিলনা বলে খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত করতে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হতো। সেসময় আরবের চাষাবাদ শুধুমাত্র সেসব জায়গাতেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে পানির প্রাকৃতিক উৎস বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া চাষাবাদ হতো অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে। এই বিস্তৃত মরুভূমিতে কেবলমাত্র মদীনাই ছিল ঝরণা এবং কূপসমৃদ্ধ সবুজ অঞ্চল। তাইগ্রিস এবং ইউফেতিস নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আব্বাসীয়রা এই সমস্যার সমাধান করেছিল। অসংখ্য খাল খননের ফলে জমিসেচ পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এসমস্ত খালের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল তাইগ্রিস এবং ইউফিতিসের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত নহরে ইসা (ইসা খাল) যা ইরাক এবং সিরিয়ার মধ্যে নৌ-যোগাযোগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এর ফলে ভারত এবং পারস্য উপসাগরের সাথে নৌ যোগাযোগের পথ সুগম হয়। ৭০২ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়ে নির্মিত খাল, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাধারগুলোর সংস্কার সাধন করে আব্বাসীয়রা। এরপরে তারা বাগদাদের চারপাশের জলাশয়গুলোকে পরিষ্কারের মাধ্যমে নগরীকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করল। মুসলিম প্রকৌশলীরা জলচাকার (পানির গতিশক্তিকে ঘূর্ণায়মান শক্তিতে রুপান্তরকারী যা পূর্বে জমিসেচের জন্য ব্যবহৃত পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রে প্রয়োগ করা হত) উৎকর্ষ সাধন করল এবং কানাত নামের অনেকগুলো বৃহদাকারের ভূ-নিম্নাস্থ পানির চ্যানেল তৈরি করল। অত্যন্ত উঁচুমানের প্রকৌশলবিদ্যা প্রয়োগ করে কানাতগুলো তৈরি করা হয়েছিল যেগুলো সামান্য কোণে হেলানো অবস্থায় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মাটির প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর পর্যন্ত, যার মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি সংগ্রহ করা হতো। এগুলোকে পরিষ্কার এবং সংস্কার করার জন্য ম্যানহোলও সরবরাহ করা হয়েছিল। এসমস্ত উন্নয়নের ফলে আব্বাসীয়দের সময়ে কৃষিব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটল যার সুফল অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হল। তখন ব্যবসা এবং জমির খাজনা থেকে প্রচুর সম্পদ আয় করেছিল আব্বাসীয় খিলাফত। আব্বাসীয়দের অধীনে ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তার প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়েছিল; যেমন ব্যবসায়িক চাহিদার কারণে হস্তশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। জনবহুল বাগদাদ নগরীতে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পী যেমন ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ, বই বাঁধাই করা, কাগজ তৈরি করা, স্বর্ণকার, দর্জি, ঔষধ প্রস্তুত করা, বেকারীর কাজ এবং আরো অনেক ধরনের কাজের জন্য প্রচুর হস্তশিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। যেহেতু এ সমস্ত হস্তশিল্পীর কাজ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে সামাজিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীতে পাশ্চাত্যে গিল্ডের (সংঘ) জন্ম দেয়। কৃষিতে উন্নয়নের ফলে উদ্যানপালনবিদ্যায় ও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১০০ বছরের মধ্যে বাগদাদ এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলগুলো প্রকৃত বাগানের রূপধারণ করল; বাগদাদ এবং কুফার মধ্যবর্তী অঞ্চল, উন্নয়নশীল শহর, উন্নত গ্রাম এবং সুন্দর উপত্যকায় পরিণত হল। বার্লি, ধান, গম, খেজুর, তুলা, তিল এবং শন প্রভৃতি ছিল ইরাকের প্রধান শস্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফলের চাষ হতো এবং ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ফলের উৎপাদন হতো। আব্বাসীয়দের সময়ে ভূমধ্যসাগরের ব্যবহার দেখে মনে হতো যেন এটি একটি ইসলামী হ্রদ। ভূমধ্যসাগর এবং এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহ যেমন সিসিলি, ক্রীট, সাইপ্রাস এবং ব্যালেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ যেগুলো ইসলামী ভূখন্ড দ্বারা তিনদিক থেকে পরিবেষ্টিত ছিল, সেগুলো মুসলিম ওয়ালীদের (খিলাফতের বিভিন্ন প্রদেশের শাসকবর্গ) দ্বারা শাসিত হতো। তিউনিস, আলেকজান্দ্রিয়া, কাদিস এবং বার্সিলোনা প্রভৃতি বন্দর পাশ্চাত্যের সাথে আব্বাসীয়দের সম্প্রসারণশীল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এই ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের সোনালি যুগে সোনালি ফসল উৎপাদনে অবিস্মরণীয় অবদান। আল্লাহর দেয়া জমিন থেকে নিজেরাই নিজেদের খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করতেন। অমুসলিমদের ঘরে হাত পাততে হতো না। কিন্তু আমরা সেসব ভুলে গেছি। আধুনিক প্রযুক্তি যত মহাকাশে পৌঁছুক, শিল্পকারখানা যত উন্নত হোক, আবাসন ব্যবস্থা ও ঘরের আসবাবপত্র যতই সুন্দর হোক না কেন, দৈনিক তিনবেলা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিন্তু ঠিকই একমুঠো ভাতের প্রয়োজন হবে। জমিনের উৎপন্ন খোরাকেই কিন্তু আমাদের জীবন টিকে আছে। তাই চাষাবাদকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তো অতি জরুরি বিষয়।

চলমান-------

লেখক: কৃষিবীদ ও গবেষক

শ্রমিক কল্যাণ ও আমাদের জীবন

টি এইচ সরকার

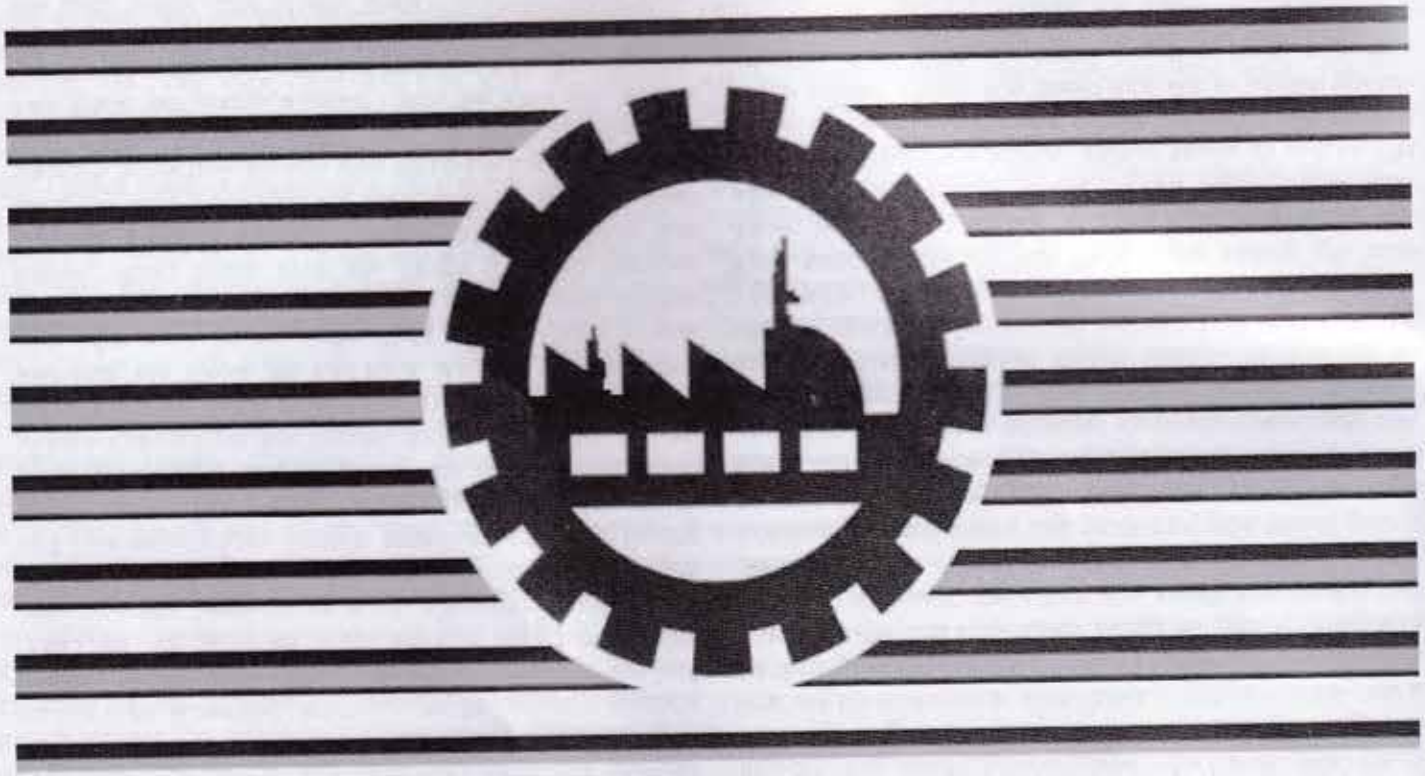

সুন্দর এ পৃথিবির বুকে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। মানুষ শান্তির সন্ধানে চারদিকে ঘুরে ঘুরে মরছে। জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার, ব্যভিচার, মারামারি, কাটাকাটি, খুন-খারাবি, রাহাজানি, রক্তপাত দিন দিন বেড়েই চলছে। দুর্নীতি আর সন্ত্রাস পৃথিবীবাসীকে ভাবিয়ে তুলছে। সমাজের কিছু লোক সাধারণ শ্রমজীবীকার ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে এক দিকে কালো টাকার পাহাড় অপর দিকে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় রোগে-শোকে খেয়ে না খেয়ে জীবন যাপন করছে। সাম্রাজ্যবাদী, সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী শক্তি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার কথা বলে মিথ্যা স্লোগান দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির নামে অসহায় শ্রমিকদের গোলামীর জিনজিরে বন্ধি করে রেখেছে। মালিক শ্রমিক দ্বন্দ লাগিয়ে এক শ্রেণীর নেতারা নিজেদের আঁখের গুছিয়েছে। এমতাবস্থায় ১৯৬৮ সালের ২৩ মে ইসলামের বিধান অনুসারে শ্রমিক সমস্যার সমাধানের মহৎ উদ্দেশ্যকে নিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এ দেশে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নামে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন (এটি একমাত্র ইসলামের পতাকা বাহি শ্রমিক সংগঠন) শ্রমিক সংগঠনের একটি জাতীয় ফেডারেশন। (বা.জা.ফে.৮) সাধারণ ভাবে যারাই পরিশ্রম করে তারাই শ্রমিক। ইসলামই হল একমাত্র বিধান যেখানে সকল মানুষের মৌলিক বিধান সংরক্ষিত, তাই শ্রমিক কল্যাণ ইসলামের বিধান মোতাবেক দেশের সাধারণ শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রমিকরা খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। শ্রমিক কল্যাণ মনে করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে দশে মিলে ছোটখাট সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধান করতে পারবে। সাধারণ শ্রমিকদের তেমন কোন চাহিদা নেই, মোটা কাপড় মোটা চাল, ডাল-ভাত জীবন সঙ্গি, অল্পতেই তুষ্ট যাদের জীবন, দেশের সিংহভাগ জনশক্তি তারাই। হাজার হাজার শ্রমিক জনতার সো-ডাউনের মাধ্যমে নেতারা বক্তৃতা দিয়ে নেতৃত্ব জাহির করে থাকে, জনপ্রিয় নেতা হয়ে নিজের আখের গোছান। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্য দাড়ি কমার মধ্যে আটকিয়ে থাকে। হাজারও সমস্যা মোকাবিলা করে একজন শ্রমিক দৈনন্দিন জীবন যাপন করে থাকে যেমন, কিছু না বলে যখন একজন রিক্শায় উঠে এবং গন্তব্যে যান তখন রিকশা চালককে কম ভাড়া দিয়ে চলে যেতে চান, প্রতিবাদ করার কিছুই থাকেনা, করলে উল্টা চড়থাপ্পর খেতে হয়। শুধু তাই নয়, একজন রিকশা চালককে সারাদিন রিকশা ঘুরিয়ে ভুল ঠিকানায় একটি বাসার সামনে দাড় করিয়ে পকেটে টাকা নাই বলে একটি

অভিনব পন্থায় বাসা থেকে টাকা এনে দেব বলে চলে যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায় কিন্তু প্যাসেঞ্জার আর ফিরে আসে না, তখন রিকশা চালকের চোখের পানি ফেলতে ফেলতে উপরওয়ালার নিকট বিচার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা। এমন অনেক অমানবিক দৃশ্য চোখের সামনে সংঘঠিত হয়েছে, এমনই একদিন ভেবেছিলাম যে শ্রমিকরা যদি ঐক্যবধ্য থাকত, তাহলে কালো হাতগুলো এত সাহস করত না। কিন্তু তারা নিজ থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, সাধারণ শ্রমিকেরা সংখ্যায় অনেক বেশি, ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি দরকার, কে হবে সেই ব্যক্তিটি। মাস্টার ডিগ্রী করা ফ্রেন্ড সার্কেল কেউ তো এগিয়ে আসবে না, প্রথম প্রথম যখন আরম্ব করলাম তখন অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, শ্রমিক বলে কথা, সারা দিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যা বাদে বারি ফিরে বিড়ি বা হুক্কা টানা, তবে আর কি। মদ, গাজা কোনটা আর বাদ নেই! এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংগঠন করা। আবার কোথাও খুবই ভাল পরিবেশ আল্লাহ্ ভীতি খোদার পেয়ারা বান্দা, তবে শিক্ষার অভাবে কু-শিক্ষা গুনেধরা সমাজে পরিণত হয়েছে। ভাল মন্দ সব মিলিয়ে বাংলাদেশের শ্রম সেক্টর বুকভরা আশা নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। ৪৯ বছরের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে শুধু শুধু বুক ভরা আশা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এমন অনেক রয়েছে, যারা দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কিন্তু অভাবি মানুষের পরিবর্তন দেখেননি। আর সাধারণ সমাজের অবস্থা কি করুন হবে তা খুবই অনুমানযোগ্য। চেষ্টা করতে দোষের কি, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে লাগলাম এবং ভাল সাড়াও পেলাম, এ ভাবে কেটে গেল অনেক বছর .....।

একদিন শ্রমিক কল্যাণের অফিসে বসে কিছু শ্রমিকের সাথে মত বিনিময় করছি এমন সময়, শ্রমিক কল্যাণের এক ইউনিট সদস্য, চারু মিয়া নামে এক রিকশা চালক অফিসে ঢুকেই কান্নাকণ্ঠে বলতে লাগল , "ভাই আমারে মাইরা ধইরা সব টাকা নিয়ে গেছে" বলে কান্না করতে লাগলো, তখন তাকে বসিয়ে তার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনলাম। সে শহরের দিকে রিকশা চালিয়ে আসছিল এমন সময় বিপরীত দিক থেকে একটি নতুন পিকআপ ভ্যান দ্রুতগতিতে আসলে রিকশার সাথে লেগে যায়। এতে পিকআপ ভ্যান ড্রাইভার ক্ষীপ্ত হয়ে রিকশা চালকের উপর আক্রমন চালিয়ে তার রিকশা ভাংচুর করে এবং টাকা পয়সা লুটপাট করে, ঘটনাটি ছিল অমানবিক দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। এমনিতেই সমাজে রিকশা চালকের পক্ষে কথা বলার মানুষ নেই আবার যদি হয় প্রভাবশালী তাহলেতো মরার উপর খরা, পুরো ঘটনাটি শুনতে শুনতে তার শরিরের আঘাতের চিহ্ন গোলো দেখে নিলাম, যাকে বলে বাজাইরা মাইর, যার ক্ষতির শেষ থাকেনা। শ্রমিক কল্যাণে জয়েন্ট করেছি মাত্র, কি করব বুঝে উঠতে পারছিনা, চিন্তায় পড়ে গেলাম যে গরম গরম করব না কি নরম ভাবে করব। আবার ভাবলাম রিকশা চালক গরিব মানুষ তার একটা উপকার করা দরকার, তাই স্থানিয় শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে ঘটনাটি মিমাংসার জন্য পাঠাই। কিন্তু, হায়রে সমাজ! একই কথা রিকশা ওয়ালার বিচার কিসের, তারা এলাকার প্রভাবশালী, তাই হালে পানি নেই, বিচারের বাণী নিরবে কাঁদে। তারা সেখান থেকে ফেরত আসলো, পরের দিন বিকেল বেলা অফিসে এসে হাজির, ভাই ঔষধ কিনার টাকা নেই, বাসায় বাজার নেই, ছোট ছোট বাচ্চা গুলো দু'দিন না খেয়ে আছে, সারা দিন রিকশা চালিয়ে বাজার করে বাসায় নিয়ে যাই কিন্তু আজ 'চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল। কান্নার জন্য কথাটুকু বলা হলনা। বুঝার আর বাকি রইলনা, প্রভাবশালীরা যখন কোন গরীবের প্রতি অত্যাচার করে, তখন শিশু আর নারীর কথা মনে থাকেনা। একজন শ্রমিকের রুজি বন্ধ হয়ে গেলে, ঘরের শিশুর মুখের হাসি বন্ধ হয়ে যায়, বৃদ্ধ মায়ের ঔষধ ক্রয় করা বন্ধ হয়ে যায়, কে কার খবর রাখে। একজন ভাইয়ের সহযোগিতায় তার বাসায় এক সপ্তাহের বাজারের ব্যাবস্থা করা হল, এতে সে অনেক খুশি কিন্তু বিচার পাবে কোথায়? প্রভাবশালীদের বিচার কে করবে? তাদেরকে সকলে ভয় পায়, তাহলে কি করার, স্থানিয় শ্রমিক নেতাদের পরার্মশ নিয়ে থানায় একটি জিডি করার ব্যবস্থা করলাম। থানায় জিডি করার পর, তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা বাদসেজে বসে আছে, কিন্তু চারু মিয়ার একই কথা আমি গরিব মানুষ, আমার কোন টাকা পয়সা নেই। তেল খরছ ছাড়া তদন্ত হবেনা। অফিসে এসে একথা বলে ভেঙ্গে পরল চারু মিয়া। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নই আমি। রির্পোট লিখে পাঠিয়ে দিলাম পত্রিকা অফিসে। পরের দিন চারু মিয়াকে খবর দিয়ে হাতে পত্রিকা দিয়ে বললাম তোমার বিচারের কাহীনি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কই কোথায় দেখানতো? কোন লেখাটা, তাই নাকি, খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলো, কনকি আমার কতা পত্রিকাতে আইছে, বিচার পাইয়াগেছি হা..হা, করে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। তখন তাকে ডেকে কাছে এনে বসালাম এবং বুঝালাম যে বিচার মাত্র শুরু হয়েছে, শেষ হয় নাই, এখন তুমি এ পত্রিকাটি নিয়ে তদন্ত র্কমকর্তার নিকট যাও, দেখ কি হয়, কথামত কাজ, পত্রিকাটি হাতে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল থানায়। ভাগ্যক্রমে সাথে সাথে পেয়ে গেল তদন্ত কর্মকর্তাকে,"স্যার আমারে যে মারছে," দেহেন পেপারে আইছে" পুলিশ অফিসার কপাল কুচকিয়ে পত্রিকার দিকে তাকিয়ে, তাকে বললো, চল দেখি তোর কোথায় কি হয়েছে। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেল ঘটনাস্থলে, ঐ প্রভাবশালীর বাড়ীর গেইটের সামনে, যখন পুলিশ ভ্যান গাড়ি থেকে নেমে আসে ততক্ষনে বাড়ীর সকল পুরুষ উধাও। পুলিশ বাড়ীর মহিলারদেরকে ডেকে মামলার বিষয়টি সম্পর্কে বলে। এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিষয়টি সমাধান করার জন্য বলে আসে। চারু মিয়া এবার ভাবতে শুরু করল, যেই কাজ টাকা ছাড়া হয়না, সেই কাজ পত্রিকায় দেখার সাথে সাথে দৌড়ে গেলো, 'পেপারের কি ক্ষেমতা'। এদিকে পুলিশের ভয়ে তাড়া খেয়ে বেড়ানো ভ্যান ড্রাইভার, খুজতে খুজতে চলে আসলো প্রথম তিন ব্যক্তির নিকট, কিন্তু কোন সমাধান হল না। শুধু একটি অফিসের ফোন নাম্বার নিয়ে চলে যেতে হলো, রিকশাওয়ালা চারু মিয়ার উপরওলাদের সাথে কথাবলার জন্য, হাসবে নাকি কাদবে ভেবে পাচ্ছে না। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। অফিসে ফোন, অনুরোধের সুরে বিষয়টি সমাধানের আকুতি। তিনদিন বাদে একটি দিন ধার্য্য করা হল, এবং একটি ভাল সমাধান হল।

লেখক: সাংবাদিক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা মহানগরী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

কিশোর গ্যাং ঃ সমাজে নতুন সংকটের নাম

সামছুদ্দোহা শাকিল

আমাদের সমাজে নতুন সংকটের নাম কিশোর! বিস্ময়কর হলেও সত্যি। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সাময়িকী 'ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট হেলথ'একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, কৈশোর এখন শুরু হয় ১০ বছর বয়সে। যে কৈশোর দশ বছর থেকে শুরু হয়, সেই বয়স এখন আমাদের কাছে আতঙ্ক! পত্রিকার পাতা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গলির মোড় থেকে চায়ের দোকান, গণপরিবহন থেকে টকশো সব জায়গায় 'কিশোরগ্যাং' বা 'গ্যাং কালচার' নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই 'কিশোর গ্যাং' বা 'গ্যাং কালচারে' জড়িতদের বয়স হচ্ছে ১০-১৭ বছর। কিশোরদের সমস্যাটা আসলে কী? হঠাৎ করে 'কিশোর গ্যাং' বা 'গ্যাং কালচার' নিয়ে মাতামাতি করার কী আছে? এই সমস্যাটা কি হঠাৎই এসেছে? আমি বিষয়টি কয়েকটি ধাপে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত, সমাজ বিজ্ঞানীরা বারংবার বলছেন, আপনার সন্তান কী করছে? কার সঙ্গে মিশছে, তা জানা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সন্তানকে সময় দেওয়া, তার সঙ্গে গল্প করা, তার মনের অবস্থা বোঝা, তার কাছে বাবা-মায়ের অবস্থান তুলে ধরা। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, অভিভাবকদের সঙ্গে সন্তানদের বন্ধন খুবই জরুরি। এই বন্ধন যত সুদৃঢ় না হবে, সন্তান তত বাইরের দিকে ছুটবে, বাইরের কলুষিত বিষবাষ্প গ্রহণ করবে। এই পথে কিশোরকে ছুটতে পরিবারই অধিক সহযোগিতা করে থাকে। তখন আর তাকে ফেরানোর কোনও রাস্তা থাকবে না।

আমরা নিশ্চয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি ক্লাবের ইতিহাস জানি। তারপরও আরেকবার গল্পটা শুনি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের তরুণ এবং তাদের গ্যাংগুলো মারামারি আর ছুরি নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় প্রায়ই তারা ঝগড়া করতো, মারামারি করতো। এতে করে সাধারণ পথচারীরা তাদের যন্ত্রণায় অতীষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৯০ সালের দিকে শহরটির কিছু দূরদর্শী মানুষ বুদ্ধি করে একটা পরিকল্পনা করলেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় তারা বস্তিবাসী যুবকদের জন্য খেলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তরুণ যুবকরা ধীরে ধীরে খেলা ও বিনোদনের জায়গাগুলোয় আসতে শুরু করলো। এতে করে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি বাদ দিয়ে খেলাতে বেশি সময় দেওয়া শুরু করলো। ঝগড়া, মারামারি, চুরি ও সন্ত্রাসের জায়গা দখল করে নিলো ফুটবল। সেই সময় ওই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি নামের দুটি ক্লাব। এর পরের ঘটনা সবারই জানা। এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি অন্যতম শক্তিশালী দুটি ক্লাব। যে ক্লাবে অসংখ্য নামি দামি ফুটবলার তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের অন্যতম সদস্য পিতা-মাতার কলহ সন্তানের

মনের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে করে, সন্তান ক্রোধ-ক্ষোভ, ঘৃণা ও হতাশা নিয়ে বেড়ে ওঠে। এর জন্য দায়ী কে? প্রশ্ন থেকে গেলো।

তৃতীয়ত, কিশোর বয়সের আবেগের দুনিয়ায় স্বপ্নগুলো সবই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সামান্য চেষ্টা আর সমাজের কাছ থেকে পাওয়া হতাশার বাণী তার মনকে করে তোলে বিষাদ। তাই যে কোনো প্রকার অপরাধ করতেই সে দ্বিধাবোধ করেনা।

চতুর্থত, আমাদের সমাজের ছেলে মেয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে মানসিক ভাবে আরও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কম্পিউটার গেইম, বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার গেইম তাদের মস্তিস্ককে করে তোলে ঠিক যন্ত্রের মতোই। যেকোনো সিদ্ধান্ত তাদের কাছে আশা করা অকল্পনীয় নয়।

আজকাল আমাদের খেলাধুলার পরিবেশ নেই। খেলার মাঠগুলো দালান কোঠা আর নাগরিক জীবনের অস্থিরতা দেখে হাহাকার করে। খেলার মাঠের অপ্রতুলতার কারণে অনেক কিশোর বিপদমুখী হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সঠিক বৃদ্ধিতে না বেড়ে ওঠে।

আমরা সবাই বলছি 'কিশোর গ্যাং'র অপরাধের কথা। তাদের বখে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন একজন কিশোর বখে যাচ্ছে, এটি আমরা ক'জন ভাবছি? সেই কিশোরেরা যদি এইভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিতো, তবে আমরাই কী ভাবতাম? কিশোর গ্যাং এর উৎপাত বেড়ে যাওয়ার আরও অন্যতম একটি কারণ হলো, সমাজের অন্য সব অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া। আমরা বারে বারে বলছি মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ কমে গেছে। কিন্তু কেন কমেছে? মানবিক মূল্যবোধ হঠাৎ করে কমে গেছে বিষয়টা তাও নয়। প্রতিটি ঘটনা ঘটার পেছনে অনেক ছোট ছোট ঘটনা দীর্ঘ সময় ধরে ঘটতে থাকে। একদিনে কিশোর অপরাধ বৃহৎ আকার ধারণ করেনি। যে কলুষিত সমাজে ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না, ইভটিজিং-এর শাস্তি হয় না, মাদক সম্রাট দেশ দরদি আখ্যাপায় সেই সমাজে অপরাধবাড়বেই এটা অস্বাভাবিক চিন্তা করাই তো বোকামি। এটি আমার কথা নয়। এটি নিউটনের তৃতীয় সূত্র 'প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।' সেই সূত্র অনুযায়ী কিশোরেরা এসব দেখছে, জানছে। তারাও ভাবছে, এখানে অপরাধ করলে শাস্তি হয় না। এটা ভেবে তারাও অপরাধে জেনে অথবা না জেনে জড়িয়ে পড়ছে।

আজকাল কিছু সিনেমা কিশোরদের উস্কে দিচ্ছে। তাদের টিম গঠন, বিভিন্ন মিশনের কার্যকলাপ দেখে কিশোরেরা নিজেদের জীবনকে ঠিক সেভাবে সাজাতে চায়। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না।

শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে উপশহর ও গ্রামাঞ্চলের সাকুলেৎ কিংবা প্রলেতারিয়েতের মতো কিশোরদের অর্থের মোহ দিয়ে তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে। এই কাজটি খুবই সূক্ষভাবে করছে রাজনৈতিক নেতারা। গনতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসবাদী করা হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে। এসব গ্যাং এর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা সর্বস্তরের জনগন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে উপরোক্ত সব কারণগুলোই যথার্থ। এছাড়া কিশোররা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি জাহির করতে একটা অনুগত অন্ধ শ্রেনী তৈরী করে। আর এটিকে আরো উৎসাহিত করছে টিকটক ভিডিও। যার মূল হোতা অপু ভাই, মামুনদের মতো ছেলেরা। সব ছেলেরা সামান্য সস্তা জনপ্রিয়তার হাওয়ায় ভেসে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে চলছে। এদের নেই কোনো নৈতিক শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা। আরও অনেক কারণ আছে, যা আমার ক্ষুদ্র মস্তিস্কে বিশ্লেষণে আমি অযোগ্য। আমি বিশ্বাস করি, কিশোর অপরাধ কমিয়ে নির্মূল করা সম্ভব। কিশোর গ্যাং থেকে ফিরিয়ে এনে কিশোরদের শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। এরজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি আমাদের সদিচ্ছারও প্রয়োজন। একদিন এই কিশোররাই সুকান্ত, নজরুলের বিদ্রোহী চেতনাকে ধারন করে অন্যায়ের বিরূদ্ধে রূখে দাঁড়াবে। জাতির দুর্দিনের কান্ডারি হয়ে দেখা দিবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখক: শিক্ষার্থী, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

“
আমরা সবাই বলছি 'কিশোর গ্যাং'র অপরাধের কথা। তাদের বখে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন একজন কিশোর বখে যাচ্ছে, এটি আমরা ক'জন ভাবছি? সেই কিশোরেরা যদি এইভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিতো, তবে আমরাই কী ভাবতাম? কিশোর গ্যাং এর উৎপাত বেড়ে যাওয়ার আরও অন্যতম একটি কারণ হলো, সমাজের অন্য সব অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া। আমরা বারে বারে বলছি মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ কমে গেছে। কিন্তু কেন কমেছে? মানবিক মূল্যবোধ হঠাৎ করে কমে গেছে বিষয়টা তাও নয়। প্রতিটি ঘটনা ঘটার পেছনে অনেক ছোট ছোট ঘটনা দীর্ঘ সময় ধরে ঘটতে থাকে। একদিনে কিশোর অপরাধ বৃহৎ আকার ধারণ করেনি। যে কলুষিত সমাজে ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না, ইভটিজিং-এর শাস্তি হয় না, মাদক সম্রাট দেশ দরদি আখ্যাপায় সেই সমাজে অপরাধবাড়বেই এটা অস্বাভাবিক চিন্তা করাই তো বোকামি।
”

মাতৃভক্তি

আম্মাকে নিয়ে আমাদের পাঁচ ভাই-বোনের গোপন মিটিং চলছে। রুদ্ধদ্বার বৈঠক, দোতলায় বড় ভাইয়ার ফ্ল্যাটে। আম্মা এখন সবার মাথা ব্যথার বড় কারণ। কোন ভাই-বোনই এখন আর উনার দেখভালের দ্বায়িত্বটা নিতে আগ্রহী নয়।

অনেকটা বাধ্য হয়েই ভাই-বোনদের এই মিটিংটা! আম্মাকে দেখাশোনার বিষয়টা পারমানেন্টলি ফায়সলা করতে। নিপা, আমাদের সবচাইতে ছোটবোন মিটিং সফল করতে সবার সাথে যোগাযোগ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে সব ভাইবোনদের স্ত্রী স্বামী সহ এ মিটিংয়ে উপস্থিত।

আমার স্ত্রী সোমা মিটিংয়ে আসার আগে পই পই করে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। যে করেই হোক আমি যেন মায়ের দেখাশোনার দ্বায়িত্বটা এভয়েড করি। আমার দুই মেয়ে দুজনেই নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আছে। একজন "এ" আর একজন "ও" লেভেলে! ভালো করে এখন ওরা বাংলাই বলতে পারে না! ভীষণ গেয়ো আর আনস্মার্ট দাদীকে ওদের একেবারেই অপছন্দ! বন্ধুদের কাছে নাকি উনাকে নিয়ে ওদের প্রেস্টিজ থাকে না!

আর সোমার কাছে মা যেন একটা মূর্তিমান আতংক। গত মাসে আমাদের কোনার বারান্দায় আম্মার পানের পিক ফেলানোর কষ্টটা সোমা এখনোও ভুলতে পারছে না। আমিও আমার স্ত্রী সন্তানদের প্রতি অনেক কেয়ারিং। বাসায় মায়ের উপস্থিতিটাতে আমারও কেন জানি ইদানিং একটু অস্বস্তি হয়। তবে মা যদি দোতলায় ভাইয়া বা তিনতলায় ছোট বোনের বাসায় থাকে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। পাঁচ তলায় উঠানামার পথে, মাঝে মধ্যে খাবার বা শাড়ী জামা নিয়ে মাকে দেখা করাটা আমার জন্য কোন ব্যাপারই না!

মিটিং শুরু হতেই বুঝতে পেরেছিলাম, প্রত্যেকের যুদ্ধংদেহী মনোভাবটা! সবাই কঠোর প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে যে করেই হোক মায়ের দ্বায়িত্বটা এড়িয়ে যাবে। তবে আপনারা যতটা খারাপ ভাবছেন, অতোটা খারাপ আমরা কেউই না। বাসায় একসঙ্গে রাখবেন না তবে টাকা পয়সা বা প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে কারোরই কোনরকম আপত্তি নেই। আমাদের মা রাহেলা খাতুন। লোকে উনাকে রত্নগর্ভা বলেন। পাঁচ ভাই-বোনকে বলতে গেলে এক হাতেই মানুষ করেছেন। আমাদের বাবা শফিকুল হক ব্যস্ত ব্যাংকার ছিলেন। তার উপর নিজের ভাইবোন বা সামাজিক কাজ নিয়েই উনি আজীবন ব্যস্ত ছিলেন! ছেলে মেয়েদের খুব একটা সময় দিতেন না। তবে আব্বা কষ্ট করে খিলগাঁওয়ের এই পাঁচতলা বাড়িটা করে গিয়েছিলেন। আমাদের ভাইবোনদের ঢাকায় থাকার সমস্যাটা সমাধান করে গেছেন বলে আব্বার প্রতি আমরা সব ভাই-বোনরাই কৃতজ্ঞ!

আম্মা অবশ্য ছোটবেলা থেকেই আব্বার অভাবটা বেশ ভালোভাবেই পুষিয়ে দিতেন। পাঁচ ভাই-বোনের জন্য এমনকি উনি একদিনের জন্যও কখনোই কোথায় বেড়াতে যাননি! খাবার দাবারের জন্যও কখনো আমাদের কোন রকম কমপ্রেন করতে হয়নি। সব কিছু রেডি থাকতো! পড়াশোনার ব্যাপারেও মায়ের ভীষণ আগ্রহ, এক বিন্দুও ছাড় দেননি। গৃহশিক্ষক বা ব্যাচে পড়ার বিষয় তদারকি করতেন কঠোরভাবে।

বড় ভাইয়া যখন বুয়েটে ভর্তি হন, মা প্রথম কিছুদিন রিকশায় করে ভার্সিটিতেও উনাকে দিয়ে আসতেন। এ নিয়ে ভাইয়ার বন্ধুরা এখনো ভাইয়াকে খেপায়! আমার বড়বোন নীপা আপা আর ছোট বোন নীলাকেও রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিদিন স্কুল কলেজে নিয়ে গিয়েছেন। নীলা আবার প্রতি শুক্রবার গানের স্কুলেও যেত, তাইতো

আম্মা আব্বার সাথে কখনোই ছুটির দুপুরটাও কাটাতে পারেনি। তবে এগুলো নিয়ে আম্মার কখনোই কোন আফসোস নেই, শেষ পযন্ত আমরা ভালোভাবে দাড়াতে পেরেছি বলেই। সবকিছুই ঠিক ছিল। গত বছর আব্বা হঠাৎ করে মারা যাওয়ার পরই বিপত্তির শুরু। আব্বার রিটায়ারমেন্টের পর আম্মার সাথেই উনার জীবন, তিনতলার ফ্ল্যাটটায় দুজনে বেশ ভালো সময় কাটাচ্ছিলেন।

এর মধ্যে বড় ভাইয়া বিয়ে করে দোতলায়, আর বড় আপা চারতলার দখল নিল। আর আমিও সোমাকে বিয়ে করে এ বাড়র পাঁচতলায় প্রায় দেড় যুগ ধরে। সবচাইতে ছোট ভাই সোহেলও বিয়ে করে এ বাড়ি ছাড়েনি, একতলার দখল নিয়েছে। শুধুমাত্র ছোট বোন নীলা বিয়ের পর রামপুরায় ওর শশুর বাড়িতে থাকতো। এই নীলাও শেষ পর্যন্ত বাবা মার তিনতলার দখল নিল, আব্বা মারা যাওয়ার পরপরই।

আব্বা জীবিত অবস্থায় আমাদের ভাইবোনদের এক সাথে থাকায় কোন সমস্যাই হয়নি। আব্বার নেতৃত্বেই সব কিছু চলতো এমনকি এক সাথে গরু কোরবানি দেওয়া। ভাইবোনরা প্রায়ই তিনতলায় বাবা মার ফ্ল্যাটে একসাথে মিলিত হতাম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছুতোয়। এরপর বট বৃক্ষ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই পরিবারের বাঁধনটা হালকা হয়ে আসতে লাগলো।

মা তখন একা হয়ে পরলেন, বাসায় আনএটেনডেন্ট অবস্থায় একবার সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার পর পালাক্রমে এখন ভাইবোনদের ফ্ল্যাটে থাকেন। তবে সত্যি বলতে আমরা ভাইবোনরা কেউই আম্মার সাথে থাকার এ বিষয়টি পছন্দ করছি না। তার উপর আম্মা প্রায় সারাবছরই অসুস্থ থাকেন। উনাকে নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ানো, ডাক্তার দেখানো বা সেবা করার মতো সময় আমাদের কারোরই নেই। প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ সংসার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাইতো একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভাইবোনদের মিটিং ডাকা, গ্রহনযোগ্য কোন সমাধান খুঁজে বের করতেই।

মিটিংটা শান্তিপূর্নই ছিল! হঠাৎ করেই ছোটবোন নীলা বড় ভাবীর কথাতে রিএক্ট করতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভাবি কিন্তু ভালো একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মাকে দেখে শুনে ভালো একটা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো। মাথা মোটা নীলা এটা শুনেই রিএক্ট করলো, ও বলতে চাইছে মা এ বাড়িতেই থাকবে। আর মায়ের দ্বায়িত্বটা নিতে হবে আমাদের তিন ভাইয়ের!

কথাটা শুনে বড় ভাবীর পক্ষ নিয়ে ছোট ভাই সোহেল নীলাকে ধমক দিতেই পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমি অবশ্য আগে থেকেই জানতাম নীলার উপর সোহেলের থাকা ক্ষোভটার কথা! বাবা মার তিনতলার ফ্ল্যাটটার দিকে সোহেলের গোড়া থেকেই নজর ছিল। নীলা ওর বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ওটার দখল নিয়ে নিয়েছিল। তাইতো সোহেল সুযোগ পেয়েই নীলাকে অপদস্থ করে ছিলো।

নীলা, বড় ভাবি, সোহেল আর পরবর্তীকালে আমাদের সবার চিৎকার চেচামেচিতে মিটিংটা আর গোপন থাকলো না। মা তিনতলা থেকে নেমে দোতলায় আসলেন। সব কথাই শুনলেন আর বুঝলেন! আম্মাকে শুধু দেখেছিলাম কাঁদতে কাঁদতে তিনতলায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে। এরপর কোন রকম সমাধান ছাড়াই মিটিং শেষ করে যে যার ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। আম্মার নাকি কান্নাটায় সোমা কেনো আমি নিজেও খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। উনার জন্যই এখন ভাইবোনদের মধ্যে এসব অহেতুক মনোমালিন্য আর ঝগড়া!

পরদিন সকালে সোমা জানালো আম্মাকে নাকি এ বাসায় আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে কিছু না বলেই ভোরে এ বাসা ছেড়ে চলে গেছেন! ভাইয়াকে ফোন করতেই দেখলাম, আম্মার এভাবে চলে যাওয়ায় উনি আমার মতই বিরক্ত, সোহেলও। আম্মার বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যে যার মত অফিসে চলে গেলাম।

লাঞ্চ আওয়ারে সোমা ফোন করে জানালো। উকিল আংকেল নাকি বিকেলে আমাদের ভাইবোনদের সাথে কথা বলতে চান। উকিল আংকেল বাবার দূর সম্পর্কের কাজিন, আমাদের পারিবারিক আইনি বিষয় আজীবন উনিই দেখে গেছেন। আর আংকেলই সোমাকে জানিয়েছেন যে মা এখন জয়পাড়ায় মামাদের বাড়িতে! কথাটা শুনে গুরুত্ব দিলাম না, সারা জীবন মামার বাড়িতেই থাকুকনা আমাদেরকে না জ্বালিয়ে। সোমাও আমার বলা কথাটায় সায় দিয়ে ফোনটা রেখে দিল।

সন্ধ্যায় উকিল আংকেলের কথা শুনে আমাদের সব ভাইবোনদের আক্কেল গুড়ুম। আব্বা মৃত্যুর আগে পুরো বাড়িটা নাকি আম্মাকে লিখে দিয়ে গেছেন। আইনত এই বাড়ির পুরো মালিকানা নাকি এখন একমাত্র আম্মারই! আর সবচাইতে ভয়াবহ সংবাদ, মা নাকি এখন বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উকিল আংকেল এসেছেন আমাদেরকে মায়ের সিদ্ধান্তটা ফর্মালি জানাতে। কথাটা বিশ্বাস যোগ্য করতে বাড়ির নতুন দলিলটাও দেখালেন, রাহেলা খাতুনের নামে।

কথাটা শুনেই আমাদের সব ভাইবোনের মাতৃভক্তি চরমে উঠে গেল! একই সাথে সবাই মাকে ফোন দিতেই, মায়ের ফোন বন্ধ পেলাম। সবাই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পরলাম, এমনকি বড় ভাবিটা কাঁদতেও শুরু করে দিলেন। অবাক হলাম আমার স্ত্রী সোমা সবার সামনে ঘোষনা দিল, আম্মা এখন আমাদের সাথে পাঁচ তলায়ই থাকবে। কিন্তু সোমার প্রস্তাবটা ধোপে টিকলো না। বড় ভাবি, সোহেল আর নীলার মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছিল, প্রত্যেকেই এখন মাকে নিজের সাথে রাখতে চায়।

আমি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলাম, এখনই জয়পাড়ায় গিয়ে মাকে নিয়ে আসবো। সোমাকে চোখ টিপ দিয়ে পাঁচতলায় নিয়ে আসলে, সেও গো ধরলো এই সন্ধ্যায় আমার সাথে জয়পাড়ায় যাবে। আম্মার পানের পিক ফেলানোর কষ্টটা এখন ওর হৃদয় থেকে কর্পূরের মত উড়ে গেছে। আশ্চর্য হলাম শুনে, আম্মার সাথে বেয়াদবি করলে ইংলিশ মিডিয়াম দুটো কন্যাকে নাকি এখন থেকে থাপ্পর দিবেও বলে!

তড়িঘড়ি করে নীচে গ্যারেজে আসতে দেখি, ভাইয়া আর আপার গাড়িও রেডি! উনারাও জয়পাড়া যাচ্ছেন মাকে আনতে। আমার গাড়ি স্টার্ট দিতেই দেখি, ছোট দুই ভাইবোন সোহেল আর নীলা এক গাড়িতে, ওরাও বোধ হয় জয়পাড়াই যাচ্ছে।

আমি অবশ্য ওদেরকে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করে আর সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। আমার আর সোমার দুজনের এখন খুব মন খারাপ। মা সেই ভোর থেকে একা আছে। ডায়াবেটিস আর প্রেসারের রোগী! ওষুধটা ঠিক মতো খেয়েছে কিনা? দুপুরেই বা কি খেয়েছে? এসব ভাবতে ভাবতেই গাড়িতে একটু স্পীড দিলাম। সময় নষ্ট করা যাবে না, না আর এক মুহূর্তের জন্যও না!

(সংগৃহীত)

যে সব পানীয় শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিশেষ ভাবে এই 'ইমিউনিটিসিস্টেম' বাড়ানোর দিকে বেশি খেয়াল দিচ্ছেন সবাই। এটি শরীরে প্রতিনিয়ত কাজ করতে থাকে, যার ফলে ক্ষতিকর ভাইরাস আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই শরীরে বিশেষ এই শক্তি বজায় রাখার জন্য খনিজ ও ভিটামিনের দরকার পড়ে। নানা ভাবেই সেটা খাওয়া যায়। তবে বেশ কিছু পানীয় আছে, যা সর্দি বা বিভিন্ন রকম ফ্লু থেকে সহজে দেবে সুরক্ষা। এখানে থাকছে এমন কিছু পানীয়র খোঁজ-

কমলা বা জাম্বুরা জাতীয় ফলের রস: এ ধরনের ফলের রস থেকে সহজে মিলবে ভিটামিন সি, যা শরীরের কোষগুলোকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে। শরীরে ভিটামিন সি এর ঘাটতি থাকলে শরীরের নানা সমস্যা রাতে বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। তাই কমলা, জাম্বুরা বা অন্য যে কোনো লেবু জাতীয় ফলের রস খেতে পারেন সহজে। এর ফলে নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হবে আরও শক্তিশালী। কারও ঠান্ডার সমস্যা থাকলে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই পানীয় তার জন্য কার্যকর দাওয়াই হতে পারে। তবে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি খাওয়ার দরকার নেই। ভিটামিন সি ছাড়াও প্রতিগ্লাস লেবু জাতীয় পানীয়তে সাধারণত যে সব উপাদান থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমলায় মিলবে পটাসিয়াম, ভিটামিন বি-৬, ভিটামিন বি-৯, জিঙ্ক এবং কমলা ও জাম্বুরায় আছে ভিটামিন এ।

সবুজ আপেল, গাজর ও কমলার রস: কমলার সঙ্গে আপেল ও গাজর মিশিয়ে তৈরি হতে পারে চমৎকার এক গ্লাস পানীয়, যা আপনার শরীরকে সুস্থ রেখে ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করবে। কমলা ও আপেল আপনার প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করবে। ভিটামিন এ আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য জরুরি একটি উপাদান, যা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বিটাক্যারোটিন আকারে গাজর থেকে সহজে মিলবে। গাজরে থাকা বি-৬ উপাদান ই মিউন সেল বাড়ানোর পাশাপাশি অ্যান্টিবডি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পানীয় তৈরি করতে ২টি বড় গাজর, ২-৩টি মাঝারি সবুজ আপেল ও ২টি কমলা লাগবে। এরপর প্রতিটি উপকরণ আলাদা করে বেলেন্ডারে বেলেন্ড করে মিশিয়ে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করতে পারেন। কেউ চাইলে স্বাদ বাড়াতে এর সঙ্গে আদা বা লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। এই পানীয় থেকে যে সব উপকারী উপাদান মিলবে, তার মধ্যে গাজর থেকে পটাসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি-৬; কমলা থেকে ভিটামিন বি-৯ আর আপেল ও কমলা দুটো থেকেই মিলবে ভিটামিন সি।

বিটরুট, গাজর, আদা ও আপেলের রস: এই চার উপকরণে তৈরি এই পানীয় খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন আজ থেকেই। দারুণভাবে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনবে এই ফলমূলের রস। এখানে ব্যবহার করা চারটি উপকণের মধ্যে তিনটিই মূল বা শেকড় জাতীয় সবজি (বিটরুট, গাজর ও আদা), তার সঙ্গে সুস্বাদু ফল আপেল মিলে তৈরি করে নতুন ধরনের স্বাদ। সবজি জাতীয় উপকরণগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রদাহ জনিত সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করে। শরীর ব্যথা, ঠান্ডা, কাশি বা নাক দিয়ে পানি পড়ার সমস্যাগুলো কমে আসে এই পানীয়র গুণে। যে সব রোগী বাতজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা এই পানীয় থেকে সরাসরি উপকার পেতে পারেন। কারণ, ব্যথা কমানোর জন্য আদা বেশ কার্যকর। এই পানীয় থেকে যে সব পুষ্টি উপাদান মিলবে, তারমধ্যে আছে পটাসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি-৬, বি-৯ ও ভিটামিন সি।

টমেটোতে থাকে প্রচুর ভিটামিন বি: সবচেয়ে সহজে ও কম উপকরণে তৈরি করা যায় টমেটোর পানীয়। এটি আপনার সময় বাঁচাতেও সাহায্য করবে। জুসারবা বেলেন্ডার না থাকলেও এই পানীয় আপনি ঘরে তৈরি করতে পারবেন। টমেটোতে থাকে প্রচুর ভিটামিন বি-৯। এই পানীয় আপনার শরীরকে সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করবে। টমেটো থেকে কিছুটা ম্যাগনেসিয়ামও মিলবে। কয়েকটা বড় আকারের গাছ পাকা টমেটোর সঙ্গে কিছুটা সেলারি পাতা, পেঁয়াজ কুচি আর এক চিমটি গোল মরিচ গুঁড়া মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন টমেটোর এই দারুণ পানীয়।

তথ্যসূত্র: মিনি মালিস্ট বেকার, হেলথ লাইন,

সিলেট বিভাগ ও মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে জেলা, থানা ও উপজেলা দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে

-ডাঃ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে দরদী মন নিয়ে শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। গত ৩ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগ ও মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে জেলা, থানা ও উপজেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জুম এ্যাপস এ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের সভাপতি ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরী সভাপতি শাহজাহান আলীর পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসাবে "আত্মগঠন ও সংগঠন পরিচালনা" বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আ.ন.ম শামসুল ইসলাম। উক্ত শিক্ষা শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসাবে "ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব, গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি" বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চল পরিচালক ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুন। শুরুতেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে দারস পেশ করেন কুদরত উল্যাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিজ মিফতাহ উদ্দিন। শিক্ষা শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট বিভাগের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ ফারুক আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সিলেট দক্ষিণ জেলা সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সিলেট উত্তর জেলা সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, সুনামগঞ্জ জেলা সভাপতি শাহ আলম, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান, অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম তালুকদার, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জালাল আহমদ, রেহান উদ্দিন রায়হান চেয়ারম্যান, ইয়াসিন খান, আতিকুল ইসলাম, আহমেদ ফারুক, ছরওয়ার হোসেই, শাহ আব্দুল মতিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে বিভাগ, মহানগরী ও জেলা প্রচার সম্পাদকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে বিভাগ, মহানগরী ও জেলা প্রচার সম্পাদকদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন আইটি বিশেষজ্ঞ আমজাদ হোসেন।

কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সভাপতিবৃন্দ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জাহিলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামী শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এই কর্মশালা। কারণ মানুষ দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না, দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আর সেই দক্ষতা অর্জনের সঠিক পথ হচ্ছে প্রশিক্ষণ। তিনি প্রচার বিভাগের গুরুত্ব তুলে ধরে দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালায় ফেডারেশনের বিভাগ, মহানগরী ও জেলার প্রচার বিভাগের শতাধিক দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. শামসুল ইসলামের জামিন বাতিলের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলামের উচ্চ আদালতের জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। গত ২ সেপ্টেম্বর ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর

রহমানের পরিচালনায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক জরুরী বৈঠকে এ দাবি জানানো হয়। সভাপতির বক্তব্যে হারুনুর রশিদ খান বলেন- সরকার বিরোধী দল ও মতকে সহ্য করতে না পেরে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরোধীমতের নেতা ও কর্মীদের উপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম.শামসুল ইসলামকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গেলে জামিন নামঞ্জুর করে জেল-হাজতে প্রেরণ করে। সরকার সামান্যতম গণতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করলে এ ধরণের কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতো। আমরা আজকের এই সভা থেকে সরকারকে নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, অতীতেও ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে বার বার মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে নেতা কর্মীদেরকে বিরত রাখা যায়নি। সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম-নিপীড়নরে মোকাবেলা করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির এ আন্দোলন আরো বেশী গতিশীল হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সত্যিকার মুক্তির আন্দোলনে ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা আরো বেশী উদ্দীপ্ত ও অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে। নির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিরাজমান করোনা পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. শামসুল ইসলামের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার আহবান জানান। পাশাপাশি সরকারের সকল প্রকারের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, শ্রমিকজনতা এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফেডারেশনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

শ্রমিক-মেহনতি মানুষ সমাজ-সভ্যতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক। শ্রমিক জনতার ঘামের বদৌলতে টিকে থাকে রাষ্ট্রের অর্থনীতি। সেই শ্রমিক জনতাকে বঞ্চিত রেখে কোনো রাষ্ট্র প্রকৃত উন্নতির স্বাদ পেতে পারে না। তাই শ্রমিক জনতার ন্যায্য হক আদায় করে দিতে হবে। আর শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ। গত ২০ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, মহানগরী উপদেষ্টা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দীকি, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ ইছহাক। উক্ত সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি ডা. আব্দুল ওয়াছি, কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, এনামুল কবির, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম পাটোয়ারী, ফেডারেশনের মহানগরী সহ সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ মোহাম্মদ শোয়াইব, দপ্তর সম্পাদক নুরুন্নবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম আরো বলেন, শ্রমিক-মেহনতি মানুষসহ সাধারণ নাগরিকদের চরম ক্রান্তিকাল চলছে। অন্যায্য ছাঁটাইয়ে বেড়েছে বেকারত্ব। একে একে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে পাটকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা। নিম্ন আয়ের মানুষরা পাচ্ছে না মৌলিক চাহিদা চিকিৎসা সেবাও। অথচ বছরের পর বছর হাড়ভাঙ্গা শ্রমের উপার্জন থেকে রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স দিয়ে আসছে জনগণ। জনগণের এ দুঃসময়ে সরকার তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। অবিলম্বে শ্রমিক জনতাসহ সকল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পূরণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। প্রধান অতিথি বলেন মূলতঃ ইসলামই ইনসাফের গ্যারান্টি। শ্রমিক জনতার ন্যায্য অধিকার আদায়, মৌলিক প্রয়োজন পূরণসহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামি শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সুতরাং ইসলামি শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের নিজ নিজ অঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার উদাত্ত আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম শামছুল ইসলাম।

সম্মেলনে আবু তাহের খান কে সভাপতি ও এস এম লুৎফর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০২০-২০২২ সেশনের জন্য ৬১ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরীর কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

কল-কারখানা গুলো শ্রম আইন ও নিয়ম- নীতির তোয়াক্কা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। -আ. ন. ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ. ন. ম. শামসুল ইসলাম বলেছেন- কল-কারখানাগুলো শ্রম আইনের কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এবং আইন লংঘন করে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাও তাদের বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছেনা। একদিকে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা অপরদিকে গণহারে ছাঁটাইয়ের শিকার হয়ে শ্রমিকগণ আয়-রোজগার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তারা অর্ধাহারে-অনাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করতেছে। গত ২৬ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি ডাক্তার আবদুল ওয়াছিসহ মহানগরী কার্যকরি পরিষদ সদস্যবৃন্দ। প্রধান অতিথি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম আরো বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষে সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটত না। প্রণোদনা প্যাকেজ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। আমরা মনে করি দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ বন্ধ করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার স্বার্থেঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। তিনি দোকান কর্মচারী, হোটেল শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের প্রণোদনার আওতায় আনার দাবি জানান। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল হোটেল রেস্তোরা খুলে দেয়া, শ্রমিকদের বকেয়া পাওয়ানা পরিশোধ করা, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মানবিক দৃষ্টিতে শ্রমিকদের দেখা ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি আহবান জানান।

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির জামিন বাতিল ও কারাগারে প্রেরণ করায় ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জনগণের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে সরকার আ.ন.ম. শামসুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে। -ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

গত ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম শামসুল ইসলামের উচ্চ আদালতের জামিন বাতিল করে কারাগারে প্রেরণের

প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উপদেষ্টা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- জুলুমবাজ বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বাকশালী শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে করোনা ভাইরাসের এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও বিরোধীদলসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে গ্রেফতারের মাধ্যমে কারান্তরীণ করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মূলত করোনাকালে বেকার সমস্যা সমাধানে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য এই ধারাবাহিক নিপীড়ন-নির্যাতনের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য নজরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা গোলাম রসূলসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ আরো বলেন- দেশে কোন আইনের সু-ব্যবস্থা নেই। বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নামে দলীয় নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চট্টগ্রাম আদালতে। জামিন পাওয়ার সব অধিকার থাকা সত্ত্বেও ভুয়া, বানোয়াট ও সাজানো মামলায় জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা আ.ন.ম. শামসুল ইসলামের জামিন বাতিল করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। জেল-জুলুম, হামলা-মামলা আর নির্যাতন করে ইনসাফ ভিত্তিক শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উপজেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে উপজেলা, পৌরসভা ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতিদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি কাজী আবুল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এবং ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের অঞ্চল পরিচালক মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি বলেন- কাঙ্খিত ইসলামী বিপ্লব ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষে আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান-অর্জন এবং উন্নত আমলি জিন্দেগীর অধিকারী হতে হবে। অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকদের নেতৃত্বের জন্য আমাদেরকে যোগ্যতা অর্জন ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালাতে হবে। উক্ত সম্মেলনে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলার উপদেষ্টাবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ফেডারেশনের বিভাগ ও জেলাসমুহের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা বিভাগ উত্তরের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা বিভাগ উত্তরের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মদ মোবারক হোসেই। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা বিভাগ উত্তরের অঞ্চল পরিচালক খান মুহাম্মদ গোলাম রসুল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগ উত্তরের জেলা নেতৃবৃন্দ।

রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের কার্যকরী পরিষদের বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সবুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক জিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া। উক্ত সভায় রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল বিভাগের ষান্মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ষান্মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন ইয়ামিনের পরিচালনায় ও বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক মাস্টার শফিকুল আলম। বৈঠকে বরিশাল বিভাগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সকল জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অতিথিবৃন্দ বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিভাগ ও জেলা নেতৃবৃন্দ ফেডারেশনের কাজকে আরো মজবুত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বরিশাল বিভাগের সদস্য বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে সকল জেলার সদস্যদের নিয়ে অনলাইনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন ইয়ামিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সদস্য বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক মাস্টার শফিকুল আলম। বৈঠকে বরিশাল বিভাগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সকল জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

টাঙ্গাইল জেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলার কর্মী সম্মেলন জেলা সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. সরকার কবির উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা গোলাম রব্বানী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের টাঙ্গাইল জেলার প্রধান উপদেষ্টা আহসান হাবিব মাসুদ, কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মনসুর রহমান, টাঙ্গাইল জেলার উপদেষ্টা অধ্যাপক খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক, গাজীপুর জেলা সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি হারুনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মিজানুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, হায়দার আলী, জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সকল উপজেলা সভাপতিবৃন্দ।

ঢাকা জেলা উত্তরের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের কর্মী সম্মেলন জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায়

অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা জননেতা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আফজাল হোসাইন, ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, গাজীপুর জেলা সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম খান, মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব হাসান মাহবুব মাষ্টার, জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সকল উপজেলা ও থানা সভাপতিবৃন্দ।

সিলেট জেলা উত্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের মাঝে ঈদ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গত ২৩ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা উত্তরের উদ্যোগে জকিগঞ্জ উপজেলা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও সিলেট সদর উপজেলার দোকান কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক, পাথর শ্রমিক, গৃহ নির্মাণ শ্রমিক ও ফার্নিচার শ্রমিকদের মাঝে ঈদ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জকিগঞ্জ উপজেলা সহ-সভাপতি এ.কে আজাদ, কানাইঘাট উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক শিবলু আমিন চৌধুরী, জৈন্তাপু উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আলিম উদ্দিন, গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি হাফেজ মিসবাহ উদ্দিন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন, সিলেট সদর উপজেলা সভাপতি সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জৈন উদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

খুলনা বিভাগ উত্তরের উপজেলা সভাপতিদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা বিভাগ উত্তরের উপজেলা সভাপতিদের নিয়ে দিনব্যাপী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মশিউর রহমানের পরিচালনায় ও সভাপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে পবিত্র কুরআন থেকে দারসুল কুরআন পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে "শ্রমিক নেতৃত্বের কাঙ্খিত মানের" উপর আলোচনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে "ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব ও গঠন পদ্ধতি" সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম এবং শ্রমিক অঙ্গনে দায়িত্বশীলদের কাজের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা বিভাগ উত্তরের পরিচালক খান মুহাম্মদ গোলাম রসুল।

ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের অগ্রসর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২২ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে অগ্রসর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ড. আজগর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে নরসিংদী জেলা সভাপতি মাওলানা শামসুল ইসলাম, মুন্সীগঞ্জ জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

কুমিল্লা মহানগরীর ইউনিট সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ইউনিট সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে দারসুল কোরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। উক্ত শিক্ষা বৈঠকে মহানগরীর ইউনিট সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের অগ্রসর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলার যৌথ উদ্যোগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের পরিচালক আযহারুল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন ফেডারেশনের মাদারীপুর জেলা সভাপতি মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন।

কুমিল্লা উত্তর জেলার ইউনিয়ন ও ইউনিট সভাপতিদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা উত্তর জেলার উদ্যোগে অনলাইনে ইউনিয়ন ও ইউনিট সভাপতিদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি, ফেডারেশনের কুমিল্লা জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান, জেলা উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মতিন, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমীন। এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বুড়িচং উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, দাউদকান্দি পূর্ব উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাহলুল, জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, জেলা শ্রম মহিলা বিভাগের সাধারণ সম্পাদিকা রাহিমা সুলতানা তাহের, মহিলা বিভাগের উপদেষ্টা ফেরদৌসী আক্তার। অ্যাড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে অনলাইনে ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মুহাম্মদ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর

রশীদ খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা আবদুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি, অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহজাহান, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমীন। এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন, শাহাব উদ্দীন, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা দক্ষিণের উপদেষ্টা মাহফুজুর রহমান, নাঙ্গলকোট দক্ষিণের উপদেষ্টা আবদুল করিম, জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ জহিরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ময়মনসিংহ জেলার উপজেলা ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৩ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে উপজেলা ও ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরাজীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দিক মানিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি মীর্জা আব্দুল মাজেদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা নির্বাহী সদস্য নজরুল ইসলাম, রুহুল আমিন রানা, মামুনুর রশীদ, আব্দুল বারী, আরিফুল হক, উপজেলা সভাপতি ইমান আলী, মাহতাব উদ্দিন, আক্তার হোসেই, নাজমুল হক, আরিফুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম রুবেল, আব্দুল কাদিরসহ উপজেলা সমুহের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

লক্ষীপুর জেলার সদর অঞ্চলের অগ্রসর কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৮ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার সদর অঞ্চলের উদ্যোগে অগ্রসর কর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের লক্ষীপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার সভাপতিত্বে ও লক্ষীপুর শহর সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল আলম মিরনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা এ আর হাফিজ উল্যাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাওলানা ফারুক হোসাইন নুরনবী, মাওলানা আব্দুর রহমান, জেলা সভাপতি মুমিন উল্যাহ পাটওয়ারী। উক্ত শিক্ষা বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হাকীম, চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা সহ-সভাপতি হেলাল উদ্দিন, লক্ষীপুর শহরের সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আখের সালাউদ্দিন নাসির ও আবুল কালাম আজাদসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

নাটোর জেলার কার্যকরি পরিষদ সদস্যদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নাটোর জেলার উদ্যোগে জেলা কার্যকরি পরিষদ সদস্যদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. সামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী অঞ্চল পশ্চিমের পরিচালক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুস সবুর এবং দারসুল কুরআন পেশ করেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মীর নূরুল ইসলাম।

শরীয়াতপুর জেলার কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন শরিয়তপুর জেলার কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মাওলানা ফরিদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মহিউ-দ্দিন শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ঢাকা অঞ্চল পশ্চিমের পরিচালক আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাসার। এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সহ-সভাপতি ও মাদারীপুর জেলা সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, জেলা উপদেষ্টা মকবুল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম, এইচ.এম. আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্যবৃন্দ, জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ পরিবহন ফেডারেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

রিক্শা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ রিক্শা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে মহানগরী ও জেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ খান এর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ মহিব্বুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তাসলিম, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল হাসেম, বিশিষ্ট মুফাসসিরে কোরআন মাওলানা কামরুল হাসান শাহীন। উক্ত সম্মেলনে ২০২০-২০২২ কার্যকালের জন্য রিক্শা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্বশীলের দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ উত্তরের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১০ জুলাই বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ উত্তরের উদ্যোগে বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি এইচ. এম. আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খান মুহাম্মদ ইয়াকুবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা কবির আহমদ। উক্ত বৈঠকে

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সভাপতি রফিকুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন, সুলতান মাহমুদ, ফিরোজ আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৩ জুলাই বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরী দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন সিদ্দীকি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এইচ.এম. আতিকুর রহমান। বৈঠকে বরিশাল বিভাগের সকল জেলা ও মহানগরীর পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দ বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন বরিশাল বিভাগের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুলাই বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন বরিশাল বিভাগের দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনলাইনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হাফেজ কামরুল ইসলাম খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা পশ্চিমের সভাপতি ইকবাল হুসাইন, বরিশাল জেলা পূর্বের সভাপতি নুরুল হক, ভোলা জেলা সভাপতি মাওলানা শামসুদ্দিন, পটুয়াখালী জেলা সভাপতি ইসহাক মুন্সি, পিরোজপুর জেলা সভাপতি আবু তাহের খান, বরগুনা জেলা সভাপতি মাসুম বিল্লাহ, ঝালকাঠি জেলা সভাপতি মেরাজ উদ্দিনসহ বিভাগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি সাংগঠনিক কাজের খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী সেশনের জন্য চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের বরিশাল বিভাগের সভাপতি হিসেবে আব্দুল কুদ্দুসের নাম ঘোষণা করা হয়।

পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৯ জুলাই বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাশার। বৈঠকে প্রধান অতিথি শ্রমিক ময়দানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর পরিবহনের কাজে আন্তরিকতা, সাহস, ভালোবাসা এবং সময় নিয়ে কাজ করার জন্য জেলা নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। টার্মিনাল ভিত্তিক সংগঠক নিয়োগ, দাওয়াতি কাজ ও ইউনিট গঠন করে সংগঠন মজবুত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুলাই বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের বিভাগীয় দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনলাইনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের বিভাগীয় সভাপতি মীর আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট জাকির হোসেই, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের নওগাঁ জেলা পূর্বের সভাপতি আসলাম উদ্দিন, নওগাঁ জেলা পশ্চিমের সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি ইব্রাহীম খলিল, রাজশাহী জেলা পূর্বের সভাপতি আব্দুস সালাম, নাটোর জেলা সভাপতি মফিজ উদ্দিনসহ বিভাগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুলাই বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন টাঙ্গাইল জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনলাইনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মুহাম্মদ আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি এস. এম. শাহজাহান, ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন টাঙ্গাইল জেলা সভাপতি শফিকুল ইসলাম। বৈঠকে কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রংপুর বিভাগের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন রংপুর বিভাগের উদ্যোগে জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনলাইনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের বিভাগীয় সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রাব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট জাকির হোসেই, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের পঞ্চগড় জেলা সভাপতি আব্দুল জলিল, ঠাকুরগাঁও জেলা সভাপতি রফিকুল ইসলাম, দিনাজপুর জেলা উত্তরের সভাপতি শরিফুল ইসলাম, নীলফামারি জেলা সভাপতি আতাউর রহমান, লালমনিরহাট জেলা সভাপতি সোহেল পারভেজ, গাইবান্ধা জেলা সভাপতি আবুল হাশেম মিয়াসহ বিভাগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ । প্রধান মেহমান সাংগঠনিক কাজের খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের বিভাগীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১০ আগস্ট বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে বিভাগীয় সভাপতি আব্দুর রউফ মোল্লার সভাপতিত্বে বিভাগীয়

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি আজহারুল ইসলাম, ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি জনাব কাজী আবুল বাসার ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব এস.এম. শাহজাহান। বৈঠকে ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের জেলা সভাপতিবৃন্দ ও চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঈদ পুনর্মিলনী

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত ২৬ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ফেডারেশনের সদস্যদের নিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মহিবুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ.এম. আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরে উপদেষ্টা ড. রেজাউল করিম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহ-সভাপতি মিজানুল হক, ছৈয়দ হাসান ইমাম, গাজী মাহবুবসহ নির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

খুলনা বিভাগ দক্ষিণ, বরিশাল বিভাগ ও বরিশাল মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা বিভাগ দক্ষিণ, বরিশাল বিভাগ ও বরিশাল মহানগরীর যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রবীণ শ্রমিক নেতা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের বরিশাল মহানগরীর সভাপতি অ্যাড. শাহ আলম ও বরিশাল বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রংপুর বিভাগ

গত ৩১ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর বিভাগের ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াসিন আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান বেলাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের জেলা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, নির্বাহী সদস্য, উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ

গত ২৭ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে বিভাগীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ড. আজগর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফেডারেশনের নরসিংদী জেলা সভাপতি মাওলানা শামছুল ইসলাম, ঢাকা জেলা দক্ষিণের সভাপতি ডাক্তার আব্দুল্লাহ হিরাসহ জেলা সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, উপজেলা সভাপতি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বি-বাড়িয়া জেলা

গত ২৪ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বি-বাড়িয়া জেলার উদ্যোগে ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান জেলা সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক সোয়াইব আলীর পরিচালনায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন- ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। আজকে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে অনেক মানুষ না খেয়ে দিনাতিপাত করছে। আজকে তাদের পাশে দাড়ানো আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন- আমাদের নৈতিক মানকে আরো মজবুত করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সাংগঠনিক কাজকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা কাজী ইয়াকুব আলী, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমিন, জেলা উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ভূইয়া। আরো উপস্থিত ছিলেন মাজিদুল ইসলাম, সায়েদ আলী, মোকবুল হোসন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মাদারীপুর জেলা

গত ২৬ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলা সভাপতি দেলোয়ার হুসাইনের সভাপতিত্বে জেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আযহারুল ইসলাম, ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি কাজী আবুল বাসার, সিনিয়র সহ-সভাপতি এস.এম. শাহজাহান ও সাধারন সম্পাদক মাষ্টার জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা

গত ২৭ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার যৌথ উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলা সভাপতি নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে ও কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াসিন আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাহী সদস্যগণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

দিনাজপুর জেলা উত্তর, দিনাজপুর জেলা দক্ষিণ ও পঞ্চগড় জেলা

গত ২৯ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দিনাজপুর জেলা উত্তর, দিনাজপুর জেলা দক্ষিণ ও পঞ্চগড় জেলার যৌথ উদ্যোগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান দিনাজপুর জেলা দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ আনোওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও দিনাজপুর জেলা উত্তর সভাপতি জাকিরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ভুইঁয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল, দিনাজপুর জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মদ আনিসুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন সভাপতি-সাধারণ

সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রংপুর জেলা ও লালমনিরহাট জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলা ও লালমনিরহাট জেলার যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ মে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের রংপুর জেলার সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গণির সভাপতিত্বে ও লালমনিরহাট জেলার সভাপতি রেনায়েল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি জননেতা আ.ন.ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রী সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের সভাপতি ফকরুল ইসলাম, রংপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব এ.টি.এম. আজম খান এবং লালমনিরহাট জেলার প্রধান উপদেষ্টা অ্যাড. আব্দুল বাতেন, রংপুর বিভাগের সভাপতি জননেতা অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। অনুষ্ঠানে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

নীলফামারী জেলা

গত ৩০ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেলার উদ্যাগে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নীলফামারী জেলার সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান পরিচালিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদল। অনুষ্ঠানে জেলা নির্বাহী সদস্যগণ, উপজেলা , ইউনিয়ন ও ওয়র্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীপুর জেলা

গত ২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার সভাপতিত্বে ও লক্ষ্মীপুর শহরের সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল ইসলাম মিরনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস.ইউ.এম. রুহুল আমিন ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মুমিন উল্লাহ পাটওয়ারী, জেলা সহ-সভাপতি ও কমলনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হুমায়ুন কবির, লক্ষ্মীপুর শহরের প্রধান উপদেষ্টা আবুল ফারাহ নিশান। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হাকিম, লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার শামসুল হুদা, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সমন্বিত শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার হারুনুর রশিদ, সালাউদ্দিন, আব্দুল্লাহ আল আখের ও ফখরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিবৃতি

অসহায় ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করুন। -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে ফেডারেশনের সকল শাখা ও শিল্পাঞ্চলকে করোনাভাইরাস সংক্রমন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষ ও নিরন্ন-ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করার আহবান জানিয়েছেন। গত ৩০ এপ্রিল দেয়া বিবৃতিতে- যথাযোগ্য মর্যাদায় আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবস পালন করার জন্য ফেডারেশনের সকল শাখাসহ সর্বস্তরের শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীকী দিবস। বাংলাদেশসহ দুনিয়ার সকল অধিকার বঞ্চিত মানুষের লড়াইয়ে মে দিবস এক অনন্য প্রেরণা। কিন্তু এবারের মহান মে দিবস এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হচ্ছে। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে গোটা বিশ্ব এখন বিপর্যস্ত। ধনী বা দরিদ্র, উন্নত বা উন্নয়নশীল, ছোট বা বড় সব দেশই আজ কমবেশি নভেল করোনা নামক এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশও এর সংক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। এ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে জনসমাগম হয় এমন সব ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে সরকার সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার শ্রমিকদের এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার্থে বিগত বছরগুলোর মত এবারের মহান মে দিবসের কর্মসূচি পালন থেকে বিরত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষ এবং নিরন্ন-ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তিনি আরো বলেন, শিকাগোর সংগ্রামের ১৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও শ্রমিক তার মজুরি, কর্মঘন্টা ও কর্মের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মর্যাদা বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয়নি জীবন যাত্রার মানের উন্নতি। শ্রমিক-কর্মচারীরা এখনো তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকেবঞ্চিত। তিনি আরো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বুঝা যায় শ্রমিকরা কতটা অসহায়। তাদের স্বাস্থ্য অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের মধ্যে মানুষের নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে সহায়-সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ঘরে থাকার চেষ্টা করছে। তখন মালিকরা নিজেদের ব্যবসায়িক মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি করার সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের স্বার্থে শ্রমিকদেরকে চাকরি থেকেবরখাস্ত করার ও বকেয়া বেতন পরিশোধ না করার ভয় দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে গ্রাম থেকে ফ্যাক্টরিতে এসে কাজ করার জন্য নির্দেশ জারি করছে। যা এক প্রকার কাজে যোগদানের জন্য বাধ্য করা। কাজেই বলা যায়, আমাদের দেশে শ্রমিকদের অধিকার আজও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, তাই আজ আমাদের ভাবতে হবে শিকাগোর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ১৩৩ বছর পেরিয়ে গেলেও শ্রমিক কেনো তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেনো আজও সেই আন্দোলন করতে হচ্ছে তাদের। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর যেখানেই শ্রমিকদের জন্য আইন তৈরি হয়েছে সেখানেই শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ রক্ষা করেই আইন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। ফলে আইনের পোশাক পরে তারা বারবার কেবল ধোঁকাই দিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকদেরকে। শুধুমাত্র শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম যে রূপ রেখা দিয়েছে তা কিয়ামাত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দেবে। এর থেকে আর সুন্দর নীতি পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। যা শুধু দিতে পারে ইসলামী শ্রমনীতি। যে শ্রমনীতিই মূলত শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে দেখিয়েছিলো প্রকৃত মুক্তির পথ। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক এবং দুপক্ষের কর্তব্য ও অধিকার ন্যায়নীতি ও সমতার মাপকাঠি। তাই তিনি অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের উদ্ধারে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের শপথ নিতে সকের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, রেশন ও আবাসনসহ ন্যায্য অধিকার পূরণে গুরুত্বপূর্ণ খাত সমূহে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের আহ্বান -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

আগামী অর্থবছরের (২০২০-২১) বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, রেশন, আবাসন ব্যবস্থা, কৃষি খাত, শিল্প খাত, পাট শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, পরিবহন সেক্টর, প্রবাসীদের পূর্নবাসন, কর্মক্ষেত্রে নিহত ও

আহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। তিনি আসন্ন ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে গণমাধ্যমে গত ১০ জুন দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, চলমান করোনা মহামারির ফলে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ যারা দৈনিক ও চুক্তিভিত্তিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল, তারা এক বড় ধরণের অর্থনৈতিক শঙ্কার মধ্যে পড়েছেন। একইসাথে প্রবাসী কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশে ফিরে এসেছেন এবং অনেকে কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রবাসী কর্মীসহ দেশের কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি সহ শ্রমিকদের খাদ্য, আবাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষা বাবদ ন্যায্য পাওনার জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে যে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার তার প্রস্তাবনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

১. স্বাস্থ্য খাত: যারা জীবনীশক্তি ক্ষয় করে দেশের ৮৪ ভাগ রপ্তানি আয় করে সেই শ্রমিকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। বর্তমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুবই ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বাজেটে এটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। করোনায় আক্রান্ত হবার পর যারা সুস্থ হয়ে উঠছেন, তারা কার্যত এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হচ্ছেন না। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পুনর্বাসনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা একান্তই জরুরি। জরুরি তহবিল গঠন করে আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুযায়ী জনশক্তির বিন্যাস সাধন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বীমা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সরকারি তহবিল থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। হাসপাতাল সেবা থেকে উদ্ভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনা মূল্যে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

২. কৃষি খাত: বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কৃষিকে আসন্ন বাজেটে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে। কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। মধ্য স্বত্বভূগীদের হাত থেকে কৃষক ও কৃষিপণ্যকে নিরাপদ রাখতে হবে। কৃষক ও কৃষিখাতকে রক্ষার জন্য কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ও কৃষিজাতপণ্য ক্রয় করতে হবে। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপনন ও কৃষকরা যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পায় সে লক্ষ্যে কৃষি পণ্য বহনের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় ট্রেন এবং সড়ক পথে পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। 'চাষীর বাড়ি, বাগান বাড়ি' ধারণার ভিত্তিতে বাড়ি-ঘরের জমিসহ ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পোল্ট্রি, ডেইরি, ফিসারিজসহ গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে। আমরা মনে করি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৩. শিল্প খাত: বাংলাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারী ও কুটির শিল্পে প্রায় আড়াই কোটি নাগরিক কর্মরত। করোনা ভাইরাসের কারণে এদের সকলের আর্থিক জীবন হুমকির সন্মুখীন। দেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে বৈদিশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। আমরা মনে করি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে শিল্প খাতে যথার্থ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৪. রেশন ও বাসস্থান: শ্রমিকদের রেশন ও বাসস্থানের জন্য বরাদ্দের দাবি অনেক পুরনো। এই দাবির পক্ষে অতীতে সর্বত্র আবেদন জানানো হয়েছে। শ্রমিকরা রাস্তায় মিছিল করেছে। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। আজ থেকে ৪০ বছর আগেও শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ও বাসস্থানের সুবিধা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেসব কর্তন করা হয়েছে। তাই আগামী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে শ্রমিকদের রেশন ও বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫.পাট শিল্প: বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও পাট পণ্যের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রাধান্য চলে এসেছে। পাট শিল্প শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ১শ' কোটি মার্কিন ডলার রফতানি হয়েছে। এই শিল্পে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা সম্ভব। কিন্তু পাটকলে যন্ত্রাংশ অন্যান্য শিল্পের মতো আধুনিকায়ন না হলে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কমবে। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী প্রদান এবং তা সঠিক সময়ে পরিশোধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই আসন্ন ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে পাট শিল্প খাত উন্নয়নে যথাযথ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৬. গার্মেন্টস শিল্প: দেশের ৮৪ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। দেশের প্রায় ৪৫ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকদের পরিবারের ৪ কোটি সদস্যের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ, এছাড়া দেশের ৫ হাজার ৫শ' গার্মেন্টস কারখানায় স্বল্প মজুরী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ সন্তান প্রসব ব্যবস্থা, পরিবহন সঙ্কট, শিল্প এলাকা ভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল, শিশু সন্তানদের জন্য শিশু লালন কেন্দ্র' শ্রমজীবী মা ও সন্তানদের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি স্থাপন করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭. পরিবহন ও অন্যান্য সেক্টর: পরিবহন খাতকে দেশের অর্থনীতির রক্ত প্রবাহের সাথে তুলনা করা যায়। প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ নিয়ে এই খাত দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যাত্রী, কৃষি ও শিল্প পণ্য পরিবহন, আমদানি রপ্তানি পণ্য পরিবহনসহ সেবা খাতের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে পরিবহন খাত যুক্ত নয়। কিন্তু এখাতের সঙ্গে যুক্ত ৬০ লাখ শ্রমিকের চাইতে ঝুঁকিপূর্ণ আর কেউ নয়। এই ঝুঁকি শুধু দুর্ঘটনার নয় তাদের জীবিকা ও চাকুরিও ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপত্তাহীন। পরিবহন শ্রমিকরা তাদের কষ্টার্জিত আয়ের একটা অংশ দিয়ে গঠিত কল্যাণ তহবিলের সুবিধা যথাযথভাবে পাচ্ছেনা। এ কল্যাণ তহবিল তসরুপ হচ্ছে। যা বন্ধে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়াও নির্মাণ খাতের ৩০ লাখ, রি রোলিং, চা, তাঁত, রিক্সা, অটো রিকশা, ইজি বাইক, ছোট দোকানদার, চা দোকানদার, হকার, পর্যটনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ, গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, সেলুনকর্মী, পাদুকা শ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি এবং যারা অর্থনীতিতে ৫০ শতাংশের বেশি অবদান রাখে তারা সব সময়ই উপেক্ষিত থাকে। কি বাজেটে, কি প্রণোদনা প্রাপ্তিতে তাদের অবস্থান নগন্য। তাই এসব খাতের ব্যাপারে কার্যকরী করনীয় নির্ধারণ ও বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮. প্রবাসীদের পুনর্বাসন: করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার শিকার হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকেপ্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্মহারা অবস্থায় দেশে ফিরে আসছেন। রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। যেসব শ্রমিকগণ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারের ও কর্মহারা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ থাকতে হবে।

৯. নিহত আহত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা দেশের উন্নয়নে কল-কারখানায় কাজ করে। কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমনকি অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। অথচ তাদের চিকিৎসার জন্য এবং নিহতদের পরিবারের পূর্ণবাসনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়না। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুর্ণবাসনের জন্য বিশেষ তহবিল গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।

১০. শ্রমিকদের দক্ষতা: শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর ও কারখানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে (ক) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (খ) জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং (গ) গবেষণা কার্য পরিচালনায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা।

১১.জাতীয় পেনশন স্কিম: জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সকল শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা। উপরোক্ত বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্বসহকারে নিয়ে আগামী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট

প্রনয়ণের জন্য আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি।

বাজেটে শ্রমিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেটে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্তের দেহ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে নেয়ার প্রস্তাবই করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের বাজেটগুলোর সঙ্গে এই বাজেটের কোনো পার্থক্য নেই। বরং অবস্থা আগের চাইতে আরও খারাপ হয়েছে। এমনকি করের বোঝা জনগণের ওপর যেভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতেই বুঝা যায় বাজেটে শ্রমিক ও দরিদ্রজনগোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। গত ১১ জুন অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য মোটা অংকের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী অবাস্তব বাজেট পেশ করেছেন সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে গত ১৩ জুন দেয়া বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন।

তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ৫ লাখ ৬৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকার মোটা অংকের যে অবাস্তব বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তা সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না বলেই দেশের অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। বিশেষ করে এই মহাদুর্যোগকালে স্বাস্থ্য খাতে দুর্বল বরাদ্দ দেশের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসহ গোটা জাতিকে হতাশ করেছে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য উচ্চাকাঙ্খী মোটা অঙ্কের ঋণ নির্ভর বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটের শিরোনাম করা হয়েছে 'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা'। বলা হয়েছে এটি হবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং মানুষের জীবন রক্ষার বাজেট। বাজেটে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ২ শতাংশ, আর বাজেট ঘাটতি হচ্ছে জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর। বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে মোট এডিপি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা, রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণ ধরা হয়েছে ৭৬ হাজার ৪ কোটি টাকা, ব্যাংক ঋণ ধরা হয়েছে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ঘাটতি ধরা হয়েছে এক লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। বাজেটের প্রায় ৩ ভাগের এক ভাগই ঋণ নির্ভর। এই ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই সরকারের নাভিশ্বাস উঠে যাবে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে করোনাকালে দিনে আনে দিনে খায় এ শ্রেণির মানুষের জন্য এবং বেকারত্বমোকাবিলায় কোনো গঠনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। করোনায় সাধারণ মানুষের আয়ে ঝুঁকি বাড়লেও সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণে বরাদ্দ আগের অর্থবছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কমেছে, যা মোট বাজেটের ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। এ খাতে চলতি বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। তাছাড়া বাজেটে কর্মহীন প্রবাসীদের দেশে পুনর্বাসন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের অস্থিরতা কাটানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৬ মাস থেকে১ বছরের মধ্যে গার্মেন্টসগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এ সময়টুকু টিকে থাকার মতো সাপোর্ট তাদের দিতেই হবে। অন্যথায় পোশাক খাত মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, করোনা দুর্যোগে আক্রান্তখাতগুলো আলোচনায় যতটা এসেছে বাজেটে ততটা গুরুত্ব পায়নি। বাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে প্রবৃদ্ধি বেশি দেখানোর প্রবণতা বাজেটের বাস্তবায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। উচ্চ আয়ের ক্ষেত্রে গত বাজেটে ৩০ শতাংশ কর ধার্য করা ছিল এবার সেটা কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে অথচ মাসে ২৫ হাজার টাকার উপর আয় করলে তাকে করের আওতায় আনা হয়েছে। ভ্যাটের আওতা বাড়ানো হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু যারা সৎ-অসৎ নানা উপায়ে বিপুল সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কর বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বরং উৎস কর, কর্পোরেট করসহ নানা ক্ষেত্রে রেয়াত দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, ফলে এ বাজেটে দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়বে। তিনি সাধারণ মানুষের মোবাইল ও সিমের ওপর কর বৃদ্ধির সমালোচনা করে বলেন, বাজেটে একদিকে সোনার দাম কমানো হয়েছে যা কিনা সমাজের সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী ব্যবহার করে। অথচ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। সেই মোবাইল, সিম ও সার্ভিসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে বাজেটে। যা সাধারণ জনগণের সাথে তামাশা ছাড়া কিছুইনা। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুর বরাদ্ধ রাখা হয়নি। বেসরকারি খাতের শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে তহবিল গঠন, জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে সকল শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করার যে দাবি ছিল তা বাজেটে প্রতিফলন হয়নি। তিনি আরো বলেন, ব্যর্থ সরকারের উচ্চাভিলাসী ও অবাস্তব কৌশলী বাজেট দেশের দরিদ্র শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে আরো হতাশ করবে।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে পোশাক শিল্পকে বৃহত্তর ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

করোনা মহাসঙ্কটকালে শ্রমিকরা যাতে কর্মহীন না হয় সে জন্যই সরকার পোশাক শিল্পের জন্য সবার আগে বড় ধরনের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া সত্ত্বেও ঘোষণা দিয়ে পোশাক শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে মালিকগন ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য পোশাক শিল্পকে বৃহত্তর ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন বলে মনে করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। বিজিএমইএ এর সভাপতি রুবানা হকের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে গত ০৫ জুন এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে চীনের রফতানি আদেশ কমেছে ৫২ শতাংশ। অন্য দিকে বাংলাদেশের কমেছে ২ শতাংশ আর ভিয়েতনামের বেড়েছে ৭ শতাংশ। ভিয়েতনামের মতো দেশের যদি রফতানি আদেশ বেড়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের কমলো কেন? ভিয়েতনাম কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে যা বাংলাদেশ নিতে পারেনি? কেন পারেনি সেই ব্যাখ্যাও বিজিএমইএ'র নেতৃবৃন্দকে দিতে হবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন আপনারা প্রণোদনাও নেবেন, ছাঁটাইও করবেন, এ দুটো একসাথে চলতে পারেনা। তিনি বলেন, সরকার শ্রমিকদের বেতনের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়েছে। ইইউ ৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। বাতিল হওয়া রপ্তানি কার্যাদেশও অনেক ক্রেতা পুনর্বহাল করেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে রুবানা হকের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘোষণা কোন ভাবেই কাম্য নয়। যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অথচ তাদের এই অযৌক্তিক ও অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে লাখ লাখ শ্রমিক সংকটে পড়বে। তাই তিনি অবিলম্বে শ্রমিক ছাঁটাই নিয়ে বিজিএমইএ সভাপতির অন্যায্য বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেছেন, চলমান মহামারী পরিস্থিতিতে সকল শিল্প কল-কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ঈদের পূর্বেই দিয়ে দিন যাতে করে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে ঈদ উৎসব করতে পারে। দুঃখ জনক হলেও সত্যি যে প্রতি বছরই কিছু কিছু মালিক ঈদের আগে শ্রমিকদের বোনাস এবং বেতন ভাতা নিয়ে টালবাহানা ও ছলচাতুরির আশ্রয় নেন। বেশির ভাগ গার্মেন্টস মালিকই শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেন না, দিলেও তা হয় ইচ্ছা মাফিক। এতে কারখানার শ্রমিকদের অমানবিক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। যার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও চরম অসন্তোষ বিরাজ করে। ফলে তারা ও তাদের পরিবার নিয়ে ঈদ

উৎসব থেকে বঞ্চিত হয়। যেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। তাই অবিলম্বে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে ঈদের পূর্বেই তাদের বেতন বোনাস পরিশোধ করতে হবে। গত ১৬ মে তিনি এক বিবৃতিতে এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, করোনা ভাইরাসের আক্রমণে শ্রমিকরা যখন অর্ধাহারে, অনাহারে জীবনযাপন করছে, যখন ঠিকমতো মজুরি পাচ্ছে না তখন এই করোনা ভাইরাসকে পুঁজি করে মালিকরা ইতোমধ্যে শ্রমিকদের বোনাস না দেয়ার টালবাহানা শুরু করেছে। অনেক মালিক অযৌক্তিক ভাবে কারখানা লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই করেছে, যা শ্রম আইনের অপপ্রয়োগ ও অমানবিক। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। এমতাবস্থায় চলমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে শ্রমিকের হাতে অর্থ না পৌঁছালে তাদের বাড়ি ভাড়া এবং খাদ্য ব্যয় যোগান দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে দেশের প্রায় ৮০ ভাগ রপ্তানী আয় করা গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষ শ্রমশক্তি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির শিকার হবে। করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী মানুষ দুর্বিষহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি অসহায়। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিতে কারখানা বন্ধ থাকলেও গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরির জন্য সরকার মালিকদের পাঁচ হাজার কোটির আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের কত শতাংশ মজুরি দেয়া হবে তা নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক এবং সময়ক্ষেপণ। এতে করে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে এবং আন্দোলন করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। তিনি বলেন, গার্মেন্টসের বাইরেও পরিবহন শ্রমিক, নৌযান শ্রমিক, রি-রোলিং ও স্টিল মিল শ্রমিক, চা-শ্রমিক, গৃহকর্মী, সেলুন কর্মী, হোটেল-রেস্তোরার কর্মী, হস্তশিল্পী, ছাপা-মুদ্রণ ও বাঁধাই শ্রমিক, স্বর্ণকার, দর্জিশ্রমিক, হকার, দোকান কর্মচারীসহ অনেক খাতের শ্রমিক, যার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। ওই সকল শ্রমিকরাও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অথচ কয়েকদিন পরেই ঈদ। তাই ঈদের আসেই সকল শ্রমিকের বকেয়া বেতনভাতা, চলতি মে মাসের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল করতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রতি তিনি আহবান জানান।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে রমযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে সকলে এগিয়ে আসুন।

-আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

পবিত্র মাহে রমযানে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে শ্রমিক- কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ বিশেষ করে গার্মেন্টস ও পরিবহন সহ সর্ব পর্যায়ের শ্রমিক এবং ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রমযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। গত ২১ এপ্রিল বুধবার রমযানকে স্বাগত জানিয়ে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এই আহবান জানান, তিনি আরো বলেন, সমাজের একটি বিরাট অংশ শ্রমজীবী। যাদের উল্লেখ যোগ্য একটি অংশ শারীরিক শ্রমজীবী মানুষ। পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে তাদের প্রতি বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের মানুষের রমজানে রোজা পালনে কষ্টকর হবে, এমতাবস্থায় তিনি দেশের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি সমাজের বিত্তবানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো হলো মাহে রামযানের দাবি। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার দাবি হল দুঃখী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসা, নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। একারণেই অসহায় মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু রাসূল (সা.) রমযান মাস কে পারস্পরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদারের অন্তরে দানশীলতা ও বদান্যতার গুণাবলি সৃষ্টি হতে পারে। মানুষকে দানশীল, সহানুভূতিশীল, মানবদরদি ও পারস্পরিক কল্যাণকামী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের প্রতিটি ইবাদত সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। তাই হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ পাক বলেছেন: হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমিও তোমাকে দান করব।' (বুখারি ও মুসলিম) বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সওগাত নিয়ে মাহে রমযান আবার সমাগত। পবিত্র এ রমযান মাস কুরআন নাজিলের মাস। পবিত্র কুরআন মানবতার মুক্তির সনদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের, মধ্যবর্তী অংশ মাগফিরাতের ও শেষ অংশ নাজাতের। এ মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে রয়েছে একটি বরকতময় রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাস সবর ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলতার মাস। এ মাসটি পূর্ণ মর্যাদা সহকারে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার সাথে পালন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মালিক ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, পবিত্র রমযান মাসে একদিকে মালিক পক্ষ শ্রম ঘণ্টা কমিয়ে যেমন শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করা উচিত তেমনি শ্রমিক ভাইয়েরা যেন সহজেই পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ী ভাইদের খেয়াল করা উচিত, যেন অযথা পণ্য সামগ্রীর দাম না বাড়ে। জনাব শামসুল ইসলাম আরো বলেন, সবাই মিলে একসঙ্গে পবিত্র রমযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। নিজে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং অন্যকে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করতে হবে। তিনি বলেন, রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। সব মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হলো মাহে রমযানের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা বজায় রাখা। অবাঞ্ছিতভাবে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে রোজাদারদের কষ্ট দেওয়ার মতো ন্যক্কারজনক কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্যারাডাইস ক্যাবল কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ন্যায্য দাবি মেনে নিন। -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে নারায়ণগঞ্জের প্যারাডাইস ক্যাবল কারখানার আন্দোলনরত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। গত ২৫ জুন এক বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এ আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুতে মানুষ দুর্বিসহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। সেখানে শ্রমিকরা অনন্যোপায় হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অথচ মালিকপক্ষ বিনা অজুহাতে আইন ও মানবিকতাকে পদদলিত করে করোনা দুর্যোগের মধ্যেও মজুরি থেকে নিম্ন আয়ের অসহায় এ শ্রমিকদের বঞ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, প্যারাডাইস ক্যাবল কারখানায় স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে বর্তমানে শ্রমিকরা বিনা বেতনে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মালিকপক্ষ পরিকল্পিত ভাবে সময়ক্ষেপণ করে ১৩ মাস ধরে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করছে না। এমনকি পূর্বের তিন বছরের ওভার টাইম ভাতা বকেয়া রেখেছে। বিগত তিন বছরের অর্জিত ছুটির টাকা, ঈদ বোনাসসহ অন্যান্য পাওনাও বকেয়া রেখেছে। যার কারণে অর্থকষ্টে, খাদ্যাভাবে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শ্রমিকদের জীবন বাঁচানোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। শ্রম প্রতিমন্ত্রীসহ শ্রম দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মহামারি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ

করছে না। অন্যদিকে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তারাও দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এমন খামখেয়ালীপনায় সবাই বিস্মিত, মর্মাহত। শ্রমিকদের পাওনা এবং মজুরি অপরিশোধিত থাকার ঘটনা বারবার ঘটছে। বিষয়টি বাংলাদেশের শিল্পের জন্য অশনিসংকেত। তাই শ্রমিকদের আন্দোলনের ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করতে মালিক-শ্রমিকের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের কর্তাব্যক্তিদের প্রতি আহবান জানান।

ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসীসহ সর্বস্তরের সকল শ্রমিক কর্মচারী ভাই-বোনদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং ঈদের আনন্দ শ্রমিকদের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এই প্রত্যাশা করেছেন। গত ২৯ জুলাই ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক যুক্ত বিবৃতিতে এই শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত নিয়ে পবিত্র ঈদুল আযহা আমাদের মাঝে সমাগত। এই উৎসর্গের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ দূর করে একটি শোষণমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা যদি ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলেই বাস্তব জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করতে পারি তাহলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব এবং ঈদুল আযহার উদ্দেশ্য স্বার্থক হবে। তাঁরা বলেন- জাতি এমন এক সময় পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন করতে যাচ্ছে যখন দেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুতে মানুষ দুর্বিষহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে অন্যদিকে ভয়াবহ বন্যায় লাখো মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায় সকলের পক্ষে ঈদের আনন্দ যথাযথভাবে উপভোগ করা সম্ভব হবে না। অন্য দিকে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, দরিদ্র ও কম আয়ের মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাই এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে ঈদ আনন্দ পূর্ণতা পাবে না তা স্পষ্ট। এমতাবস্থায় নেতৃদ্বয় দেশের সকল বিত্তবান ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান- দরিদ্র ও অসহায় মানুষের দিকে সাহায্য ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করার জন্য। সর্বপরি তারা পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য সাধ্যমত নিজেদের উদ্যোগে যত দ্রুত সম্ভব পরিস্কার করে অন্যকেও সচেতন করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসী শ্রমিকসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া কামনা করেন, তিনি আমাদের সবাইকে সুন্দর পরিবেশে ঈদুল আযহা উদযাপন করার ও ঈদুল আযহার শিক্ষা বাস্তব জীবনে ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তহবিল শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝে সুষ্ঠু বন্টনের উদ্যোগ নিতে হবে।

-আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল শ্রমিকদের মাঝে সুষ্ঠু বন্টনের উদ্যোগ নিতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্রান্তিলগ্নে এই শিল্প খাতকে টিকিয়ে রাখা এবং ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা সময়োপযোগী হয়েছে। গত ২৬ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঘোষিত এই তহবিল যাতে সঠিক ভাবে শ্রমিকরা পায় সেজন্য সরকারকে যথাযথভাবে মনিটরিং করতে হবে। মধ্যস্থতাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে এটি অন্য দিকে খরচ করতে না পারে সেই দিকে নজর দিতে হবে। আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম আরো বলেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বেতন পায়। যে বেতনে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সব সময় মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। তাই বেতনের নিশ্চয়তা না থাকলে তাদের ক্ষোভ-অসন্তোষ সামাল দেয়া কঠিন হবে। সঙ্গত কারণে বিজিএমইএ নেতারাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়কে রপ্তানীমুখী শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সঠিক সময়ে পরিশোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তহবিলের অর্থ দ্বারা কেবল শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি, বিজিএমইএসহ সরকারকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সাথে করোনা ভাইরাস বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা গার্মেন্টস শিল্পের ৫০ লাখ শ্রমিকের স্ব-বেতনে ছুটি নিশ্চিত করে অবিলম্বে গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ ঘোষণা এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুনরায় আহবান জানান।

করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি রোধে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আহ্বান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম গত ১৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতিতে আমরা উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়েছে। ফলে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তিনি আরো বলেন, দেশে করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে করোনাভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ মানুষ ও সংস্থা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি জোরদার করেছে। কিন্তু বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আমাদের দেশে বিশেষ করে শ্রমঘন এলাকায় গার্মেন্টস, পরিবহন, নৌ-পরিবহনে কতটুক প্রস্তুত? এ প্রশ্ন ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকার জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিলেও একেকটি গার্মেন্টসে শত শত নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করছেন। বাস স্ট্যান্ডে, নৌ-বন্দরগুলোতেও গাদাগাদি অবস্থা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক ও যাত্রীরা অনেকটা নিরুপায়। মানুষকে সচেতন করতে কিছু কিছু প্রচার চালানো ছাড়া কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি বলে মনে করেন তিনি। বিবৃতিতে তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যেকোনো রোগব্যাধি ও অসুখ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে কতগুলো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। করোনা ভাইরাস থেকেও নিরাপদ থাকার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এসব সতর্কতামূলক পরামর্শগুলো মেনে চলার ব্যাপারে আমরা দেশবাসীসহ শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

১. হাঁচি অথবা কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যু অথবা রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখা ২. ঠান্ডা লাগা বা কাশি হওয়া রোগীদের সংস্পর্শে আসার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা ৩. জীবন্ত বন্য অথবা ফার্মের গবাদি পশুর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা ৪. সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে খুব ভালোভাবে হাত পরিষ্কার রাখা ৫. গোশত ও ডিম খাবার সময় ভালোভাবে সিদ্ধ করা ৬. প্রচুর পরিমাণ ফলের রস ও পানি পান করা ৭. মুখে মাস্ক ব্যবহার করা। তিনি গার্মেন্টস, গ্যারেজ ও পরিবহন মালিকদের অনুরোধ করে বলেন, আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সচেতন করার পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যাপ্ত সাবান-পানি অথবা হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখা। সম্ভব হলে শ্রমিকদের জন্য মাস্ক রাখা। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, দেশের শ্রমজীবী মানুষ যাতে সুস্থ ও রোগব্যাধি মুক্ত অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হবে। করোনা

ভাইরাস প্রতিরোধর উপকরণ সমূহ সহজলভ্য করার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে দিশেহারা না হয়ে অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত থেকে মহান আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত দোয়া করা দরকার। সর্বপরি তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমাজের দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ, সামর্থবান ব্যক্তি ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সর্বস্তরের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি করোনা ভাইরাসসহ সকল প্রকার ব্যাধি থেকে দেশ ও জাতিকে হেফাজত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করার আহ্বান জানান।

ঈদুল আজহার পূর্বেই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে হবে। -বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান বলেছেন, সকল শিল্প কল কারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ঈদুল আজহার পূর্বেই দিয়ে দিন যাতে করে শ্রমিকরা ঈদ উৎসব তাদের পরিবার নিয়ে করতে পারে। প্রতিবছরই কিছু কিছু মালিক ঈদের আগে শ্রমিকদের বোনাস এবং বেতন ভাতা নিয়ে টালবাহানা ও ছলচাতুরির আশ্রয় নেন। এতে কারখানার শ্রমিকদের অমানবিক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। তারা ও তাদের পরিবার নিয়ে ঈদ উৎসব থেকে বঞ্চিত হয়। যেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। তাই গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস ঈদের আগে অতিদ্রুত পরিশোধের জন্য গত ২০ জুন এক যৌথ বিবৃতিতে কারখানার মালিকদের প্রতি নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, গত রমজানের ঈদ শ্রমিকরা প্রচন্ড কষ্টে অতিবাহিত করেছেন। মালিকদের দুরভিসন্ধি ও অবহেলার কারণে শ্রমিকরা বেতন-বোনাস নিয়ে দুর্ভোগের পাশাপাশি ছাঁটাই এবং লে-অফের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। সরকারের প্রণোদনা নিয়েও মজুরি পরিশোধে তালবাহানা করেছে অনেক গার্মেন্টস মালিক। এই পরিস্থিতি যেন কুরবানি ঈদের সময় না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন নেতৃবৃন্দ। তাঁরা আরো বলেন, করোনার কারণে বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষ পুরোপুরি বেকার হয়ে পড়েছে। মানবিক এই বিপর্যয়ের সময়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়েছে। যা শ্রমিকদের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেছে। তার উপর করোনার সঙ্গে ঝড়-বন্যা মরার উপর খাঁড়ার ঘা। ফসলহারা কৃষকরা অর্ধাহারে-অনাহারে ক্ষুধায় হাহাকার করছে। দেশের এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাহায্য নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন নেতৃবৃন্দ। তাঁরা কৃষকদের জন্য খাদ্য দ্রব্যসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সামগ্রী ও বিনা সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সাথে স্বচ্ছল, দানশীল ব্যক্তি, সাহায্য সংস্থা এবং বিশেষ করে শ্রমিক কল্যাণের নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদেরকে দুর্গত এলাকার জনগণের পাশে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

সরকার পরিকল্পিত ভাবে পাট কল বন্ধ করে পাটশিল্পকে ধ্বংস করছে -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্তের অভাব এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দের অভাবে পাটশিল্পে কাঙ্খিত উত্থান তো ঘটছেই না, উল্টো এ শিল্প দিনে দিনে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে রেখে সরকার, পাটকলগুলোর সংকট ও শ্রমিকদের দুর্দশা বছরের পর বছর জিইয়ে রেখে পরিকল্পিত ভাবে পাট কল বন্ধ করে পাটশিল্পকে ধ্বংস করছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম। গত ১৫ জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রক্রিয়ায় ছাঁটাই করে পাটকল বন্ধ করে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, পাট কল বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই কোনো সমাধান নয়। শ্রমিকদের ছাঁটাই না করে কীভাবে পাটকলকে লাভজনক করা যায় সে উপায় বের করা দরকার ছিল। প্রতিটি সরকারের লুটপাটের বলি এই পাটশিল্প। শ্রমিকরা বলছেন, 'লোকসান হয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণের কারণে'। এই দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা কখনোই নেয়া হয়েছিল কী? সরকারি পাটকলের উৎপাদনশীলতা কম অথচ উৎপাদন খরচ বেশি। ভরা মৌসুমে পাট কেনা হলে ও উৎপাদিত পণ্য ঠিকমতো বিক্রির ব্যবস্থা করলে মিলগুলোয় কোনো ক্রমেই লোকসান হওয়ার কথা নয়। পাটকলগুলোয় পাট ক্রয় থেকে কারখানা চালানোর নানা স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়ে থাকে। কম পাট কিনে বেশি দেখানো, ভেজা পাট কিনে শুকনা পাটের দাম দেওয়া ইত্যাদি নানা দুর্নীতি চলে। তাহলে লোকসানের দায় শ্রমিকদের ওপর চাপানো হয় কেন? তিনি বলেন, বাজেটে বরাদ্দ করা অর্থ গোল্ডেন হ্যান্ডশেক হিসেবে না দিয়ে পাটকলের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় করলে পাটকলগুলোকে লাভজনক করা যেতো। পাটকলগুলো পিপিপি মডেলে চালানোর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেওয়ার মতোই। যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন ও সময় মতো কাঁচা পাট কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিলে, বিজেএমসির দুর্বল বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার ও দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে সরকারি পাটকলগুলো লাভের মুখ দেখতো।

জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের প্রায় ৩ লাখ সদস্য এবং পাটচাষী পরিবারের ৩ কোটি সদস্য পাট ও পাট শিল্পের সাথে যুক্ত। তাদের জীবন ও জীবিকা ধ্বংসের আত্মঘাতি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে পাটকলসমূহ আধুনিকায়ন করে কার্যকর, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের ভ্রান্তনীতি, দুর্নীতি এবং প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই পাটশিল্প নিয়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত -আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেন- দুর্নীতি, অনিয়ম, অদক্ষতা,কর্মকর্তাদের ভুল পরিকল্পনা, অপচয়, লুটপাট, সরকারের ভ্রান্তনীতি, প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে পাট শিল্প নিয়ে সরকার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে করোনার মতো এত বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন করে দেশের ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের ২৫ হাজার শ্রমিককে কর্মহীন করার সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গত ২৯ জুন এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, পাটকলগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, কারণ হিসেবে ক্রমাগত লোকসানের কথা বলা হয়েছে। আবার একই সাথে পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) ভিত্তিতে পুনরায় পাটকলগুলো চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তার মানে বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালিত হলে লোকসান হবে না। অর্থাৎ, সমস্যাটা পাট শিল্পের নয়। সরকারের ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, লুটপাট আজকে পাট শিল্পকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অথচ কয়েক দশক ধরে এই শিল্পই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ ছিল। তিনি পাট উৎপাদনের তথ্য দিয়ে বলেন,গড়ে বর্তমানে পৃথিবীতে ১৯ লাখ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৩২ লাখ মেট্রিকটন পাট উৎপাদন হয়ে থাকে। যার শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি অর্থাৎ ৮.৩৩ লাখ মেট্রিকটন বা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ২৬.০২ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদন হয়ে থাকে। অথচ বিশ্বব্যাপী পাটপণ্যের চাহিদা ও গুরুত্ব বাড়লেও বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন পাট উৎপাদনকারী বাংলাদেশ তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর ভারত বাংলাদেশ থেকে পাটের কাঁচামাল কিনে সেটা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রি করে মুনাফা গড়লেও পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিকাশের জন্য যে

পরিমাণে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন আমাদের রাষ্ট্র তা করছে না বরং পাটকলগুলো সরকার বন্ধের ষড়যন্ত্র করছে।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে হোটেল-রেস্তোরা খুলে দিন

-বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই দেশের হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে পড়ে এ খাতের কর্মরত লাখ লাখ শ্রমিক। দীর্ঘ সময় কর্মহীন থাকার ফলে এ শিল্পের শ্রমিকরা বর্তমানে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অবিলম্বে স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে সারাদেশে সকল হোটেল-রেস্তোরা খুলে দেয়ার জন্য আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। গত ২৮ জুন এক বিবৃতিতে তিনি এই দাবি জানান।

তিনি আরও বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে সীমিত পরিসরে অন্যান্য জন-গুরত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হলেও হোটেল রেস্তোরা এখনো সব বন্ধ রয়েছে। এই শিল্পের সাথে জড়িত লাখ লাখ শ্রমিকের বেকারত্বের ফলে তাদের রোজগারের উপর নির্ভরশীল দেশের জনগণের একটা বিরাট অংশ অনাহার-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছেন। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে ত্রান-সামগ্রী পাওয়া থেকে এ শিল্পের শ্রমিকরা অনেকটা বঞ্চিত হয়েছে। শামসুল ইসলাম বলেন, দূর পাল্লার পরিবহন শ্রমিক, যাত্রী, অফিস, কল-কারখানা শ্রমিকরা ডিউটি কালীন সময়ে হোটেলের তৈরী খাবারের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। ফলে হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকায় সাধারণ শ্রমিকদের নানাবিধ ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ক্ষুদ্র হোটেল-রেস্তোরা মালিকেরাও দীর্ঘদিন ব্যবসা বন্ধ থাকায় আর্থিক অনটনে পড়েছেন। মানসম্মত হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ থাকায় মানুষ যত্রতত্র অস্বাস্থ্যকর ও নিম্ন মানের খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে করোনাসহ অন্যান্য রোগ ব্যাধির প্রকোপ বাড়ার আশংকা রয়েছে। তাই অবিলম্বে তিনি হোটেল রেস্তোরাঁ খুলে দিয়ে এই শিল্পের সাথে কর্মরত লাখো লাখো শ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীল হত-দরিদ্র মানুষদের জীবন জীবিকার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান এবং স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করন পূর্বক বন্ধ হোটেল-রেস্তোরাঁ খোলার জন্য নিম্নোক্ত পরামর্শ প্রদান করেন ১. কমপক্ষে ৩ ফুট দুরত্ব নিশ্চিত করে গ্রাহকদের জন্য টেবিল সাজানো ২. প্রতি টেবিলে ৪ জনের বেশি গ্রাহক না বসানো ৩. হোটেলের প্রবেশ মুখে হাত ধোয়া ও পায়ে জীবাণু নাশক ছিটানো ৪. মাস্ক বিহীন গ্রাহক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ৫. শ্রমিকদের জীবাণু রোধক পোষাক, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস প্রদান ৬. হোটেলের অভ্যন্তরে জীবাণু মুক্ত পরিবেশ তথা ধোয়া মোছার ব্যবস্থা তদারক বৃদ্ধি করা ৭. রান্না ঘর, নাস্তার ষ্টান্ডসহ খাবার প্রস্তুত কাজের স্থাপনা সমূহ প্রয়োজনীয় দূরত্বে স্থাপন, তাপ নিয়ন্ত্রণ, উন্মুক্ত আলো বাতাসসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.ন.ম. শামসুল ইসলামকে গ্রেফতারে তীব্রনিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম উচ্চ আদালতের নির্দেশে নিম্ন আদালতে হাজির হলে জামিন পাওয়ার সব অধিকার থাকা সত্বেও সরকারের ষড়যন্ত্রে জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ১ সেপ্টেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে তারা এ দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকার নিজেদের দেশ পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতা ও দুর্নীতিকে আড়াল করতে অব্যাহত ভাবে জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে কোন শ্রেণী পেশার মানুষ বাদ পড়ছেনা। তারই ধারাবাহিকতা আজ জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা আ.ন.ম. শামসুল ইসলামকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে প্রেরণ করেছে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, দেশে আজ গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকতার বলতে কোন কিছুই নেই। বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রভাবে লাখ লাখ মানুষ যখন কর্মহীন হয়ে পড়েছে তখন তাদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার ভিন্নমত দমনে অত্যাদিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের জুলুম নির্যাতন ও দু:শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য তাঁরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার আদালতকে ব্যবহার করে শ্রমিকদের ন্যায়ভিত্তিক অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র করছে দেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তা নস্যাত করে দিবে। তারা অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে শ্রমিক নেতা আ.ন.ম. শামসুল ইসলামকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

শোকবাণী

শ্রমিক নেতা মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আব্দুল গনীর মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

চট্টগ্রাম বন্দর ইসলামী শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আব্দুল গনী ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম গত ৭ এপ্রিল শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে মুহাম্মদ আব্দুল গনী একজন দৃঢ়চেতা, ইসলামী আদর্শনিষ্ঠ শ্রমিকনেতা হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। দৃঢ়তা, অটুট মনোবল এবং ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন অনন্য উচ্চতায় একজন ব্যতিক্রমী শ্রমিকনেতা। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সকল সংগ্রামে তিনি রেখেছেন অসামান্য অবদান। তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শের বাস্তব ও মূর্ত প্রতীক। তিনি আজীবন আদর্শ, চরিত্রবান, সৎ খোদাভীরু শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার কর্মময় জীবন আদর্শ জীবন গড়ার জন্য প্রেরণা দিবে। শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য মুহাম্মদ আব্দুল গনী ৭৩ বছর বয়সে সোমবার (৭ এপ্রিল) রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। মরহুমের জানাযার নামাজ চট্টগ্রাম বন্দর কবরস্থান মসজিদ চত্বরে দুপুর ১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে বন্দর থানার একদল পুলিশ গার্ড অব অনার ও পরিবারের কাছে ক্রেস্ট প্রদান করেন। এসময় জানাযায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, স্থানীয় কাউন্সিলর শফিউল আলম, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চলের সভাপতি আবু তালেব চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মুক্তিযুদ্ধা আবুল কালাম মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক শিহাব উল্লাহ। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএ সহ-সভাপতি মোকাররম হোসেন মুকুল, সাধারণ সম্পাদক নায়েবুর রহমান ফঠিক, সিবিএ সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শ্রমিক দল নেতা নুরুল্লাহ বাহার, চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক নেতা নুরুল মোস্তফা ও এস.এম. জাকারিয়াসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। মৃত্যুকালে তিনি

স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনি ও আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

এ.বি.এম হাবিবুর রহমানের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, খালিশপুর (পিপলস) জুটমিল লিঃ হাইস্কুলের সাবেক সিনিয়র শিক্ষক, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১২নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এবং দারুল কুরআন ক্যাডেট মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও সমাজ সেবক মাওলানা এ.বি.এম হাবিবুর রহমান ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৬ জুন যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তারা বলেন, বাংলাদেশের ইনসাফপূর্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মাওলানা হাবিবুর রহমান নিজ অবস্থান থেকে শিক্ষা, সমাজ ও জাতি গঠন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং দেশ ও জাতির বিশেষ করে শ্রমিকদের কল্যাণে নিঃস্বার্থে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। তিনি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ছিলেন আপোষহীন। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক শ্রমিক জনতার কল্যাণকামী মহান অভিভাবক। তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শের বাস্তব ও মূর্ত প্রতীক। তিনি আজীবন আদর্শ, চরিত্রবান, সৎ, খোদাভীরু শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার কর্মময় জীবন আদর্শ জীবন গড়ার জন্য প্রেরণা দিবে। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য মাওলানা এ.বি.এম হাবিবুর রহমান ৭০ বছর বয়সে ৫ জুন রাত ১১.৩০ টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের জানাযা সকাল ৮টায় তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলমসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে তার কফিন দাফনের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার সাতারপাইয়াত গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদ মাগরিব জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়। তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলামের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলা সভাপতি, শীতলগাড়ি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক তাজুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ১৭ জুন ২০২০ যৌথ শোকবাণী প্রদান করেন। শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাজুল ইসলাম নিজ অবস্থান থেকে শিক্ষা, সমাজ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে তিনি আমৃত্যু সক্রিয়ভাবে ভুমিকা রেখে গেছেন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন নেতা। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন- মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তায়া'লা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য তাজুল ইসলাম ৪৮ বছর বয়সে ১৭ জুন রাত ৩ টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের জানাযা দুপুর ৩টা তার প্রতিষ্ঠিত শীতলগাড়ি হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাওলানা এটিএম আজম খান ও অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী, ফেডারেশনের রংপুর বিভাগের সভাপতি আবুল হাশেম বাদল, রংপুর জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গনী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক রাব্বানী, মিঠাপুকুর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা এনামুল হকসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে তার গ্রামের বাড়ি মিঠাপুকুর উপজেলার শীতলগাড়ি গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়। তিনি স্ত্রী,২মেয়ে আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রমিক নেত্রী আমেনা খাতুনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা কমিটির অন্যতম সদস্যা ও ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের দায়ীত্বশীলা আমেনা খাতুন গত ৬ জুন সৌদি আরবে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৭ জুন যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, শ্রমিক নেত্রী হিসেবে আমেনা খাতুন দেশের শ্রমজীবী মহিলাদের মাঝে ইসলামী শ্রমনীতির প্রচার-প্রসার এবং নারী শ্রমিকদেরকে ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুসারী হিসেবে গঠন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি একজন জনপ্রিয় শ্রমিক নেত্রী ছিলেন। সমাজসেবা মূলক কাজে তিনি আমৃত্যু ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার খেদমতসমূহ কবুল করুন এবং তার জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তার শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য আমেনা খাতুন সৌদী আরবে অবস্থানরত ছিলেন, সেখানে অসুস্থতা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মরহুমা আমেনা খাতুনের স্বামী সৌদী আরবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

শ্রমিক নেতা আব্দুল মতিনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন ৭৩ বছর বয়সে ১২ আগস্ট বুধবার সকাল ৯.৩০ টায় বার্ধক্যজনিত কারণে সিলেট উপশহরের নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এক শোকবার্তায় তাঁরা এই শোক প্রকাশ করেন। শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, আব্দুল মতিন শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং শ্রমিকসমাজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। আব্দুল মতিনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাকে নিরাপত্তা দান করুন। তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করুন ও তার কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুণাহখাতাগুলোকে নেকিতে পরিণত করুন। তার জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। নেতৃবৃন্দ শোকবাণীতে তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের

প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য, মরহুম আব্দুল মতিন মৃত্যুকালে স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযার নামাজ সিলেট উপশহরের জামে মসজিদে বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের চৌদ্দগ্রাম উপজেলা দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম শোকবানী প্রদান করেছেন। শোকবানীতে তিনি বলেন, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন নিজ অবস্থান থেকে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণে তিনি আমৃত্যু সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে গেছেন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন নেতা। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, মরহুমের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে দোয়া করছি। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এই শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। উল্লেখ্য মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ৬০ বছর বয়সে ২৭ জুলাই দুপুর ১২টায় ঢাকার একটি প্রাইভেট হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মরহুমের জানাযার নামাজ নিজ গ্রামে বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূইয়া, ফেডারেশনের কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার, খন্দকার দেলোয়ার হোসেই, অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহাজাহান হোসেন, ফেডারেশনের কুমিল্লা জেলা দক্ষিণের সভাপতি খায়রুল ইসলামসহ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি স্ত্রী, ৩ মেয়ে, ২ ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তররের সভাপতির মাতার ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তররের সভাপতি ড. ছৈয়দ এ.কে.এম. সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকির মাতার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দ এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমা চশমে জাঁহা বেগমের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তার নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। উল্লেখ্য মরহুমা চশমে জাঁহা বেগম গত ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.২০ টায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৫ ছেলে ৪ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমা চশমে জাঁহা বেগমের গ্রামের বাড়ী লাকসাম পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের বাইপাস মৈশান বাড়ীতে রাত ৯টায় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

চরকালকিনি ইউনিয়ন শ্রমিক নেতার মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা নেতৃত্বন্দের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার ১নং কালকিনি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও মতির হাট বাজারের বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান মোটর সাইকেল এক্সিডেন্টে মৃত্যু বরণ করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের মৃত্যুতে শোকাভিভূত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটওয়ারী ও কমলনগর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ুন কবির এবং উপজেলা সভাপতি ডাক্তার মোহাম্মদ ইউসুফ। নেতৃবৃন্দ মরহুমের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করেন এবং মরহুমের পরিবার যেন ধৈর্য্য ধারন করতে পারেন সেই জন্যে তাওফিক কামনা করেন। আমিন।

শ্রমিক নেতা কাজী আবুল কালাম আযাদের পিতার ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

গত ২৬ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল কালাম আযাদের পিতা জালাল উদ্দীনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম জালাল উদ্দীনের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোআ করেন, আল্লাহ যেন তাঁর নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী করেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। উল্লেখ্য মরহুম জালাল উদ্দীন মঙ্গলবার বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১০৮ বছর। তিনি ৪ ছেলে ৬ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম জালাল উদ্দীনের গ্রামের বাড়ী সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার নাটুয়াপাড়া ইউনিয়নের বিসুন্দরা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার তল্লা এলাকার বাইতুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মুসল্লি নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার এক যৌথ শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে নেতৃবৃন্দ বলেন- ৪ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার তল্লা এলাকার বাইতুস সালাত জামে মসজিদে এশার নামাজ আদায়ের সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন। তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হলে ১৪ জন মারা যান। প্রায় ৪০ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারের সঙ্গে আমরাও গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের আশু-সুস্থতা কামনা এবং তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি। নেতৃবৃন্দ আহত ও নিহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন এবং অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠুতদন্ত সাপেক্ষে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার

৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪